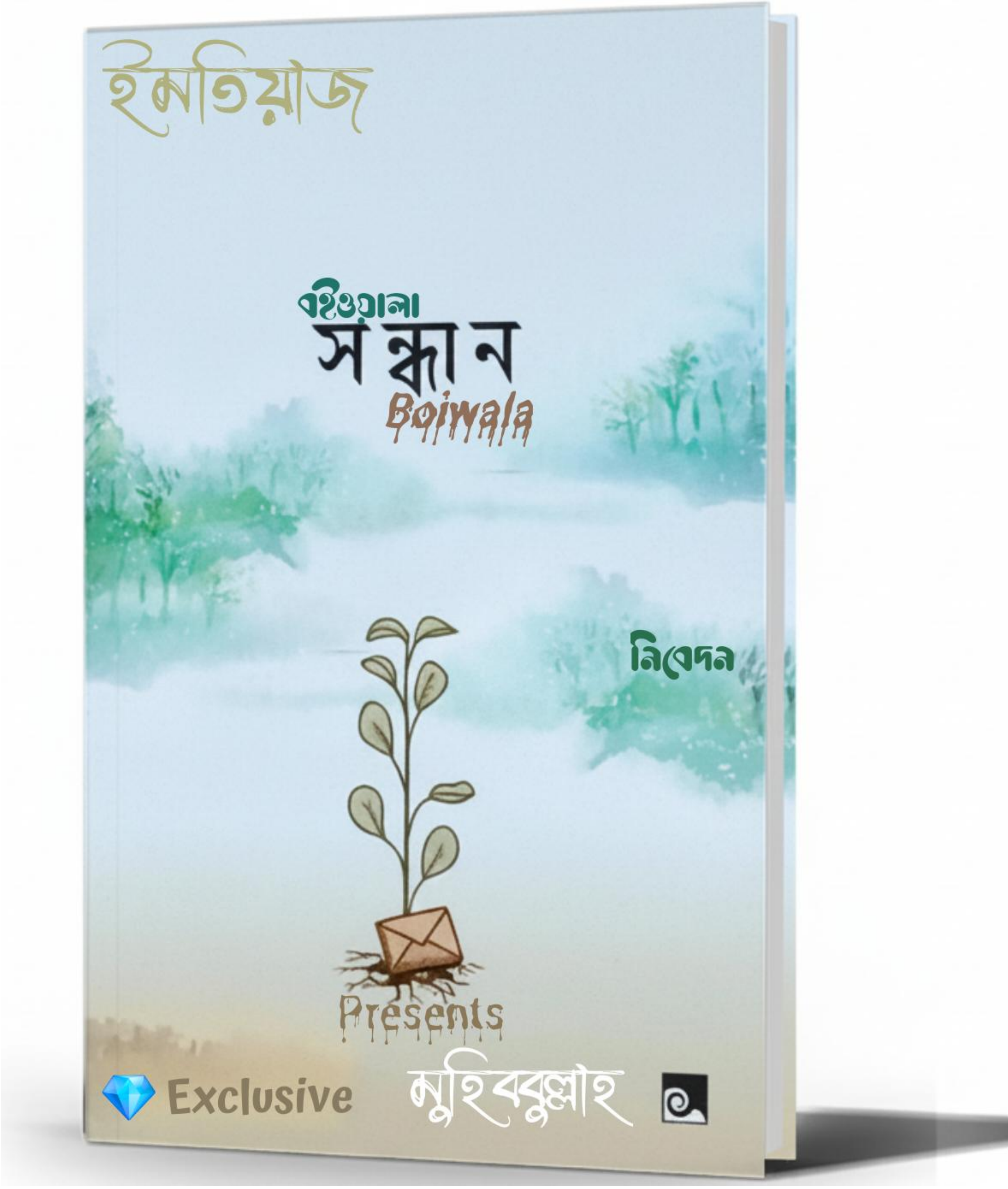

ইমতিয়াজ
বইওয়ালা
সন্ধান
Boiwala
নিবেদন
Presents
Exclusive
মুহিব্বুল্লাহ

সংক্ষিপ্তসার...

সন্ধানী সেন। জীবনের স্বাভাবিক যাপন-পথেই সে কিছু জিনিস সন্ধান করে বেড়ায়। বন্ধুরা এগিয়ে আসে। যা প্রমাণ করা যায় না, তা খুঁজতে নিষেধ করে কেউ কেউ। সন্ধানীর মন মানে না। গাণিতিক সমীকরণ, টেস্টটিউবের ভেতর উৎকট গন্ধের বিক্রিয়া আর গবেষণাপত্রের কিলবিলে রেফারেন্স লিস্ট যথেষ্ট মনে হয় না তার কাছে। বাসায় এসে বাবা-মায়ের খেলার পুতুলগুলো দেখে। ছোটো-বড়ো, সাদা-কালো নানা রকম পুতুল। একটি পুতুলের এক ডজন হাত, আরেকটির চেহারায় শুঁড়, অন্যটির পেছনে লেজ, কোনোটির মুখ থেকে বেরিয়ে আছে লকলকে জিভ। এখানেও শান্তি পায় না সে। খেলতে ইচ্ছে করে না ওগুলো নিয়ে। চারপাশে তাকায় সন্ধানী, দৃশ্যমানকে দেখে অদৃশ্যের কথা ভাবে। কখনও ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ ডেকে ওঠে। বলতে চায় যে, কাঠখোট্টা প্রমাণান্ধতা আর শিশুতোষ পুতুলখেলার মাঝামাঝি কিছু একটা আছে। সন্ধানীর অনুসন্ধান একটি উপসংহারের দিকে যেতে শুরু করে...

হুজুর হয়ে টিম

www.facebook.com/Hujur.Hoye/

বইওয়ালা পরিবেশনা...

Boiwala Presents...

সন্ধান

তুমিও কি ঊষর গেরুয়া মাটিতে একা একটি মলিন গুল্ম? শেকড় ছিঁড়ে যাবার ভয়ে আটকে আছ? তোমারও কি ইচ্ছে করে দূরের ওই সবুজ ছায়াবীথির কাছে ছুটে যেতে? মনের কথা আটকে থাকে মুখবন্ধ খামে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সন্ধান

হুজুর হয়ে টিম
সমর্পণ প্রকাশন

প্রকাশ
সন্ধান

ISBN : 978-984-8041-44-4
প্রকাশক : রোকন উদ্দিন
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৯
পৃষ্ঠাসজ্জা, মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায় : বই কারিগর ০১৯৬৮৮৪৪৩৪৯

অনলাইন পরিবেশক :
রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ, আল ফুরকান শপ, বই বাজার, তারিক জান

মূল্য : ২১৭ টাকা

সমর্পণ প্রকাশন
৩৪, মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯
facebook.com/somorponprokashon

লেখক : হুজুর হয়ে টিম
সম্পাদক : সমর্পণ টিম
প্রচ্ছদ : শরিফুল আলম
পৃষ্ঠাসজ্জা : আবদুল্লাহ আল মারুফ
শারঈ সম্পাদিকা : ফারহীন জান্নাত মুনাদি

কল্যাণী বললেন, "সোনু, একটা কথা বলি শোন। স্রষ্টা কোটি কোটি মানুষের জীবনের গল্প লিখেছেন। কিন্তু কোথাও এতটুকু গোঁজামিল নেই, বুঝলি? এর ভেতরে কেউ যদি নতুন করে গল্প বানায়, এতে অনেক স্ববিরোধিতা থাকে।"

Acknowledgements & Fair Use Notice

Personal Intent & Grace
This digital edition was prepared solely for my own personal use and benefit. If our brothers and sisters find this work beneficial to their own learning and spiritual growth, then this is truly an Ehsan (Grace and Favor) from Allah Sub'hanahoo Wa Ta'ala. Any good within this work is from Allah, and any errors are my own.

Our Gratitude To:

- Islamic eBook Creator Team: (https://t.me/IslamicEbookCreatorTeam) for providing the platform and resources to create this eBook.
- Boimate (https://boimate.com/sondhan-pdf/) for the original source files and materials.
- Zahid Hasan Bhai (@ZahidKhair): Special thanks for your constant support and brotherhood, from you I learned proofreading within the Islamic eBook Creator Team.

Support & Updates:
To join my personal group for more eBooks and resources, click the link below:
🌐 Boiwala বইওয়ালা

সূচীপত্র

সবুজ সরণি

মেয়েটার আইসক্রিম খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে এটা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তার। মনে মনে হাসতে হাসতে নিজের হাতে থাকা আইসক্রিমে কামড় বসাল দ্যুতি।

সহানুভূতির একটা হাত তার কাঁধে রেখে দ্যুতি বলল, “গণরুমে খুব কষ্ট বুঝি?”
“আপু! গরম, মশা, জায়গা কম...” একটানে অভিযোগ করে যেতে থাকল মেয়েটা।

চুপ করে পুরোটা শুনে গেল দ্যুতি। আসলে ফার্স্ট ইয়ারে অনেকেরই এমন অবস্থায় পড়তে হয়। হঠাৎ নতুন পরিবেশে দিশেহারা হয়ে যায় তারা। কোনো সিনিয়রের কাছ থেকে একটু আদর পেলে একদম বর্তে যায়।

অ্যাডমিশন টেস্টের সময়কার কথা। বাবার সঙ্গে কাকভোরে ক্যাম্পাসে ঢুকল মেয়েটা। কোনো স্টলে তখনও কেউ আসেনি। শুধু ‘আজাদ সংঘে’র স্টলে ছিল দ্যুতিরা দু-চারজন। মেয়েটা এখানে এসেই জানতে চেয়েছিল কলা অনুষদ ভবন কোন দিকে। ভর্তি হয়ে হলে ওঠার একদিন পরেই ছুটে এসেছে তাদের পাঠচক্রে, সবুজ সরণিতে। পাঠচক্র শেষে এই মেয়েটাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে এসেছে দ্যুতি।

“আপু, আপনাদের সংগঠনটা আমার খুউব ভালো লেগেছে। আমি প্রত্যেক সপ্তায় আপনাদের পাঠচক্রে আসব।” আইসক্রিম শেষ করে মেয়েটা বলল।

এতে দ্যুতির যত না ভালো লাগল, তার চেয়ে বেশি অপরাধবোধ জন্ম নিল ওর মনে। মানুষ যার কাছে দানাপানি পায়, তার দাস হয়ে যায়। সবুজ ভাইয়া তো এ কাজটা করতেই নিষেধ করত। এ লক্ষ্যেই তো ‘আজাদ সংঘে’র গোড়াপত্তন। কেউ কারও দাস হবে না। সবুজ ভাইয়া মানুষটা ছিল প্রচণ্ড প্রথাবিরোধী। আজাদ মানে স্বাধীন, সেইসাথে এ দেশের একজন প্রথাবিরোধী মনীষীরও নাম। মনে পড়ে ফার্স্ট-সেকেন্ড ইয়ারের দিকে সবুজ ভাইয়ার সাথে তাদের দলবেঁধে গভীর রাতে ক্যাম্পাস চষে বেড়ানোর কথা। গিটারের টুংটাং আর গাঁজার ধোঁয়ায় সিদ্ধি লাভের স্মৃতি।

আবারও ফেল করে ভাইয়া যে বছর দ্যুতিদের ব্যাচমেট হয়ে গেল, সে বছরই তার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে খুব বেশি ভেঙে পড়ে। মৌলবাদীরা এ নিয়ে অনেক হাসি-ঠাট্টা করত বটে। ব্যক্তিগত বদভ্যাস আর আদর্শিক বিশুদ্ধতার পার্থক্যটা বদ্ধ মস্তিষ্কের মানুষরা বুঝবে কী করে? তাই সেটা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায়নি ‘আজাদ সংঘ’। ওই মাসেই সবুজ ভাইয়ার মৃত্যু হয়। মানুষ মরে যায়, কিন্তু আইডিয়া বেঁচে থাকে। সবুজ ভাইয়ার লেগ্যাসি ধরে রেখে এখনও ক্যাম্পাসে মুক্তবুদ্ধির চর্চা জারি রেখেছে সংঘের সভ্যরা। নিয়মিত-অনিয়মিত মিলিয়ে সংঘের সদস্য এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। সাপ্তাহিক পাঠচক্রের জায়গাটাকে অফিসিয়ালি ‘সবুজ সরণি’ নাম দেওয়ার জন্য আন্দোলন করা হলেও কর্তৃপক্ষ সেটা কানে তোলেনি। মৌলবাদী আর তাদের ভাবশিষ্যরা জায়গাটাকে বিদ্রূপ করে ডাকে অন্য নামে।

“কেন? কী দেখে এত ভালো লেগেছে? মাত্রই তো একদিন আসলি।” প্রশ্ন করল দ্যুতি।
“এই যে আপনাদের আচরণ এত সুন্দর, সবাই এত ফ্রেন্ডলি....”

"ব্যস? এতটুকুই? আমাদের কোনো কাজ দেখে, কথা শুনে মনে প্রশ্ন জাগে নাই? বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা হয় নাই?"

মেয়েটা হয়তো ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে। কিন্তু দ্যুতির কাছে মনে হচ্ছে সে আদতে ঘাড়ত্যাড়া, ঠিক যেমনটা সংঘের সভ্যদের হওয়া উচিত। এখন ভয় পেয়ে চুপ করে আছে। এই ত্যাড়ামিটা বের করে আনলেই ব্যস! নতুন একজন সভ্য পাওয়া গেল।

"কারও কাছ থেকে আইসক্রিম খেয়েই বর্তে যাবি না, বুঝছিস?"
মেয়েটা চুপ।
"বুঝছিস?" আরও জোরে বলল দ্যুতি।
"জি, আপু।"

শেষ হয়ে যাওয়া আইসক্রিমের কাঠিটা একদিকে ছুড়ে ফেলে দ্যুতি বলল, "এখন বল, কোনো প্রশ্ন জাগে নাই?"
মেয়েটা চুপ করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "হ্যাঁ, জাগসে।"
"কর তা হলে।"
"আপনারা তো বলসিলেন, আপনারা অবিশ্বাসী।"
"হুম।"
"কিন্তু আবার বললেন মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, মানবাধিকারে, সমঅধিকারে বিশ্বাস করেন, ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন।"
"আচ্ছা।"

আলাপটায় আগ্রহ পাচ্ছে দ্যুতি। ফার্স্ট ইয়ারের একটা মেয়ে এত দ্রুত বিষয়গুলো ধরে ফেলবে, তা অনুমান করতে পারেনি আগে। ফাইনাল ইয়ারে ওঠা অনেক হাঁদারামের মাথায়ও এসব আসে না। নামে মাত্র মুক্তমনা হলে যা হয় আরকি।

"এগুলোও তো একেকটা বিশ্বাস না? মানে আমার যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে, এটার কি কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে? আপনার যে ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে, এইটা কি গাণিতিকভাবে প্রমাণ করতে পারবেন? বা পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের কোনোটা দিয়ে কি এইটা বোঝা যায়? কোন জিনিসটাকে প্রমাণ বলে ধরব? মানবাধিকারটাও তো আমাকে কেউ-না-কেউ দিবে। তারাই-বা আমারে অধিকার দেয়ার কে?" এটুকু বলে থামল সে।

"Go on." ভারি একটা কণ্ঠ শুনে পেছন ফিরে তাকাল দ্যুতি। রাশেদ এসেছে। তার সহযোদ্ধা, প্রেমিকও বটে। সেই সবুজ ভাইয়াদের সময় থেকে দুজন একসাথে আছে। ক্যাম্পাসের মোস্ট সিনিয়র হিসেবে বলতে গেলে সবুজ ভাইয়ার স্থানটাই ওর।

"আদাব, ভাইয়া।" বলতে বলতে উঠে দাঁড়াতে নিল মেয়েটা। রাশেদও বসতে বলল, দ্যুতিও এক কাঁধে চাপ দিয়ে তাকে বসিয়ে দিল। কাউকে অতিরিক্ত সম্মান দেখিয়ে ঈশ্বরের স্থানে তুলে ফেলাটা আজাদ সংঘের কোড অব কন্ডাক্টের সাথে যায় না।

চোখের সানগ্লাসটা খুলে দ্যুতির গা ঘেঁষে বসল রাশেদ। বলল, "হুম, বলতে থাক। আর কোন কোন জিনিসগুলা আসলে বিশ্বাস, যেগুলাকে আমরা অন্ধভাবে মানি?"

মেয়েটা আরেকজন সিনিয়রের সামনে ধাতস্থ হতে একটু সময় নিল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে বলল, "জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র সবই একেকটা বিশ্বাস। ব্রিটিশরা মাটির উপর দাগ কেটে দিছে বলে একটা অংশকে হিন্দুস্তান, আরেকটা অংশকে পাকিস্তান বলে বিশ্বাস করা। আবার জিন্না যে জায়গাটাকে পূর্ব পাকিস্তান বলে বিশ্বাস করত, আমরা সেই জায়গাটাকে বাংলাদেশ বলে বিশ্বাস করি।"

দ্যুতি বোঝার চেষ্টা করল মেয়েটা বুঝেশুনে বলছে কি না, "কেন? এখানে তো আমরা সবাই বাংলা বলি। তো?"

"পশ্চিমবঙ্গের লোকেরাও তো বলে, না? নাকি ওদেরটা বাংলা না?" এবার একদম পাক্কা ঘাড়ত্যাড়ার মতো করে বলল মেয়েটা।

দ্যুতি আর রাশেদ মিটিমিটি হাসতে হাসতে চোখাচোখি করল। এই তো বের হচ্ছে।

মেয়েটা বলে যাচ্ছে, "পাহাড়ি আদিবাসীরা বাংলা বলে? চট্টগ্রামের বাংলাটা কি বাংলা? সিলোডের-টা? তো ম্যাপ চেইঞ্জ হয় না কেন? কোনো কারণ নাই। আমরা বিশ্বাস করি এই জায়গাটার নাম বাংলাদেশ, তাই বাংলাদেশ। সব দেশের ক্ষেত্রেই একই কথা খাটে।"

"এই তো মেয়েটার মুখ চালু হচ্ছে।" ভাবল দ্যুতি।

পকেট থেকে বেনসনের একটা শলা বের করতে লাগল রাশেদ। দ্যুতির ডান হাতটাও তার পার্সে চলে গেল। রাশেদ ঠোঁটে সিগারেট বসানোমাত্রই লাইটার দিয়ে তাতে আগুন দিল দ্যুতি। তারপর লাইটারটা রেখে দিল পার্সে। আড়চোখে দেখল মেয়েটার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়।

নাক-মুখ দিয়ে একপশলা ধোঁয়া ছেড়ে রাশেদ বলে চলল, "এইবার বাকিগুলা বল। গণতন্ত্র কেন একটা বিশ্বাস?"

মেয়েটা বলতে শুরু করল, "রাজা সব ক্ষমতার মালিক, এটাও যেমন বিশ্বাস, জনগণ সব ক্ষমতার মালিক, এটাও বিশ্বাস। কোনো ল্যাবরেটরিতে এগুলা প্রমাণ করা সম্ভব না। রাষ্ট্র থেকে ধর্ম আলাদা থাকতে হবে, এই কথাটাও একটা বিশ্বাস, মানে নিজেই একটা ধর্ম। কার্ল মার্ক্স বলসে ধর্ম হলো আফিম ...."

"জনতার আফিম।" দ্যুতি সংশোধন করে দিল।

"ও হ্যাঁ, স্যরি। জনতার আফিম। কিন্তু উনি নিজে যেই মতাদর্শ প্রচার করে গেসেন, সেইটাও ধর্ম। তাই তিনি নিজেও আফিম ডিলার।"
এই বলে মেয়েটা চুপ হয়ে যাওয়ায় রাশেদ বলল, "আর?"
"উমম....এই তো। আর তো জানি না।"

রাশেদ পকেট থেকে একটা ১০০ টাকার নোট বের করে চোখের সামনে ধরল। বলল, "এইটা আরেকটা বিশ্বাস। কোটি কোটি মানুষ মিলেমিশে এইটার মূল্যমানে বিশ্বাস করে। হঠাৎ একদিন

যদি এই কোটি কোটি মানুষ এইটার উপর ঈমান হারায়া ফেলে, তা হলেই শেষ! ওই মুহূর্ত থেইকা এইটা একটা কাগজের টুকরা ছাড়া আর কিছু না। সোনা-রুপা-কড়ি-কয়েন, সবগুলার ব্যাপারেই একই কথা।"

দ্যুতি আবারও মেয়েটার দিকে তাকাল। চোখ ছানাবড়া হয়ে চোয়াল ঝুলে পড়েছে তার। বলল, "আসলেই তো!"

দ্যুতি জানাল, "তার মানে কিছু কিছু বিশ্বাসের দরকার আছে। সবাই মিলে কিছু একটায় বিশ্বাস করাটা সামাজিক....আই মিন দলবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য দরকারি।"

মেয়েটা কিছুক্ষণ ভেবে তুড়ি মেরে বলল, "মনে পড়সে! এইসব ধর্মও তো কেউ-না-কেউ প্রবর্তন করসে।"
দ্যুতি বলল, "অবশ্যই। আমরা জাইনা বা না-জাইনা ওই ধর্মপ্রবর্তকদের দাস হইয়া আছি।"
"তা হলে আপু, আপনাদের এত পাঠচক্র, মুক্তচিন্তা, প্রথাবিরোধিতা...."
"কারণ," দ্যুতি বলল, "আমরা বুঝেশুনে একটা ধর্ম বেছে নিসি। বাপ-দাদা যেসব কেতাব পড়ত, সেগুলা চোখ বন্ধ করে মানি নাই। নিজেরা একটা কিতাব লিখে সেটারে আসমান-থেকে-আসা বাণী বলে দাবি করি নাই। সন্ধানী সেন, কিছু একটাতে বিশ্বাস করাই লাগে। তুইও করবি। তবে যা-ই বিশ্বাস করবি, বুইঝা শুইনা করবি।"
"জি আচ্ছা।" বলল সন্ধানী নামের মেয়েটা।

"যা," রাশেদ বলল, "তোর আজকের দীক্ষা কমপ্লিট।"

দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে গেল সন্ধানী। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে সাইকেলের সামনের ক্যারিয়ারে রাখল। তারপর প্যাডেল মেরে হলের দিকে রওনা দিল।

রাশেদের হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে একটান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দ্যুতি বলল, "You knew this day will come."
"হুম। আসুক, সমস্যা নাই। তিন-চার বছর ধরে কয়েকটা গরু-ছাগল আসছে-গেছে আমাদের সংঘে। সবাইই হুজুগের নাস্তিক, বিজ্ঞানপূজারি। একজন বুঝ-জ্ঞানওয়ালা মেম্বার আসুক। নাইলে তো সংঘটারে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না কয়েক বছর পর।"

বৈপরীত্য

ঠাকুরের মূর্তির সামনে হাতজোড় করে অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করছিলেন কল্যাণী। ঠাকুরঘরে মোবাইল ফোনের বিকট শব্দে চমকে উঠলেন, আশ্বস্তও হলেন খানিকটা। স্ক্রিনে **Sonu** নাম উঠে আছে। বাম হাতের মুঠোয় ফোনটা ধরে রেখে চোখ ছোটো ছোটো করে কিপ্যাডের দিকে তাকালেন। তারপর ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে দেড় সেকেন্ড চেপে ধরে রাখলেন সবুজ টেলিফোনের ছবিযুক্ত বোতামটা। এরপর মোবাইলটা কানে লাগিয়ে বললেন, "হ্যালো?"

ওপাশ থেকে শোনা গেল, "মা, আমি ক্যাম্পাসে পৌঁছেছি এক ঘণ্টার মতো হলো।"

ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভঙ্গিতে দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে আবার ফোন কানে লাগালেন কল্যাণী। বললেন, “নেমে কিছু খাওয়াদাওয়া করেছিস তো, সোনু?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ। ক্যান্টিনে খেয়ে নিয়েছি।”

“ক্লাস না দশটায়? দশটা তো প্রায় বাজে, মা। যাসনি?”

“...হ্যাঁ? হ্যাঁ, ক্লাসেই তো এখন। স্যার আসেননি এখনও, মা। শুনছ না চারদিকে চ্যাঁচামেচি?”

কল্যাণী বিদায় বলতে নিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। ভালো করে কান পেতে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর বললেন, “অ্যাই! অঙ্ক নিয়ে দুটো মেয়ে কথা বলছে কেন? এরা নিশ্চয় তোর গণরুমের বান্ধুবি? সত্যি করে বল তো মা। পৌঁছতে দেরি হয়েছে? ক্লাসে যেতে পারিসনি, তাই না?”

ওপাশ থেকে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলার শব্দ হলো। আওয়াজ এল, “হুম। মাত্রই হলে ঢুকলাম। গোসল করে খেয়েদেয়ে টাইম থাকলে ক্লাসে যাব। ডাবল স্লট তো।”

কল্যাণী বললেন, “সোনু, একটা কথা বলি শোন। স্রষ্টা কোটি কোটি মানুষের জীবনের গল্প লিখেছেন। কিন্তু কোথাও এতটুকু গোঁজামিল নেই, বুঝলি? এর ভেতরে কেউ যদি নতুন করে গল্প বানায়, এতে অনেক স্ববিরোধিতা থাকে।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শব্দ করে হেসে সন্ধানী বলল, “আর গল্পের ভেতরে থাকে মায়েদের মতো কিছু ক্যারেক্টার, যারা বানানো গল্পের ভুল ধরতে ওস্তাদ।”

কল্যাণীও হেসে ফেললেন, “এখন বিশ্রাম নে। খারাপ লাগলে আজ আর ক্লাসে যাওয়ার দরকার নেই।”

“তারপর আমি আর এইটা নিয়ে কোনো কথা তুলি নাই।” পাশ ফিরে নুসরাতকে কথাটা বলতে গিয়েই ইলমা খেয়াল করল পেছনের বেঞ্চে সন্ধানী বসা। ইলমাকে তাকাতে দেখে হাত নাড়ল ও।

ইলমা বলল, “কী রে? পাঁচ মিনিটের জন্য ক্লাস করতে আসলি?” কথা শুনে নুসরাতও পেছন ফিরে সন্ধানীকে দেখে “হাই” বলল।

সন্ধানী বলল, “আসলাম।”

সেমিস্টার ব্রেকের অল্প ছুটিতে বাড়ি যায়নি অনেকেই। ক্লাসফাঁকিবাজ আর ঘরপাগল সন্ধানী ঠিকই বাড়ি থেকে একচোট ঘুরে এসেছে। ক্লাসের অল্প কিছুক্ষণ বাকি ছিল। শেষ হওয়ার পর সন্ধানী গিয়ে ক্লাসের অন্য ফ্রেন্ডদের সাথে কুশল বিনিময় করতে লাগল। ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল ইলমা।

সন্ধানী বলল, “চইলা যাবি?”
“ভার্সিটির বাসে করে যাব ভাবতেসিলাম। কিন্তু এখনও তো অনেক দেরি।”
“আজকে আমাদের পাঠচক্র আছে। চল আমার সাথে। ওইখানে কিছুক্ষণ থেকে ক্যান্টিনে

গিয়ে লাঞ্চ করে বাসে উঠে যাস।”
“কই যাবি? গাঞ্জা চত্বরে?” সন্ধানীর পাশে এসে কিছুটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল কাব্য।
“হুম। তুই যাইবি গাঞ্জা খাইতে?”
কাব্য স্টাইল করে বলল, “ওইসব গরিবরা খায়। আমার তো জ্যাক ড্যানিয়েলস না হলে চলেই না!”
“আহারে!” প্রায় একইসাথে বলে উঠল ইলমা আর সন্ধানী।
“তোর জন্য বাংলা মদ বানায়া দিব, চল।” সন্ধানী বলল।
টিপু এসে যোগ দিল, “বাংলা নিয়া কথা হচ্ছে? আমি খাব। চান্দা কত?”
“ভাত জোগাড় কর। চান্দা লাগবে না।”

ইলমা মাঝখান দিয়ে বলল, “সন্ধানী, তুই যা। আমি না হয় ডিপার্টমেন্টেই থাকি।”
“হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাইস না, ইলমা।”
টিপু বলল, “একদম নাস্তিক হইয়া যাইবি।”
“আরে ধুর! আস্তিক-নাস্তিক ব্যাপার না। আমার এমনিই অত দূর যাইতে ভাল্লাগতেসে না।”
“কী আর করা। আমিই যাই। ফ্রেন্ডস, টাটা।”

ইলমা দেখল তার ফ্রেন্ড সার্কেলের সবাই যার যার গন্তব্যে চলে যাচ্ছে। খানিক ভেবে ডাক দিল, “সন্ধানী, দাঁড়া।”
সন্ধানী তার জন্য থেমে অপেক্ষা করল। কাছে এলে বলল, “তুই চিন্তা করিস না। এখানে কেউ কাউকে নাস্তিক বানায় না। জাস্ট বইটই পড়ার পর সেগুলা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে।”
“না, আমার সমস্যা নাই।”
“রিকশা নিব?”
“হাঁটি, চল।”

ক্যাম্পাসের ভেতরের পথ ধরে সবুজ সরণির দিকে যেতে লাগল দুজন। কিছুদূর হাঁটার পর একটা ছোট্ট গোলাপের চারা দেখিয়ে সন্ধানী বলল, “ইলমা দ্যাখ, এইটা আমার লাগানো।”
“অনেক সুন্দর।” ইলমা হেসে বলল।

আবার হাঁটতে শুরু করল তারা। একটু পর সন্ধানী বলল, “অনেকদিন পরে যাইতেসি রে। ফার্স্ট সেমিস্টারেও অত বেশি যাই নাই। প্রথম প্রথম মজা লাগত, যাইতাম। এরপর যখন প্রত্যেক দিন ইয়া মোটা মোটা বই পড়ার অ্যাসাইনমেন্ট দিতে লাগল, তখন মানে মানে কেটে পড়লাম।”

“বই পড়া আর তুই? ইম্পসিবল কম্বিনেশন।” হাসতে হাসতে বলল ইলমা।

“কম হইলে পড়া যায়। ধর দিনে আধা ঘণ্টা। কিন্তু এরা কেমনে জানি ২৪টা ঘণ্টা বই নিয়া থাকে। আরে নর্মাল কথাবার্তাই ওই দার্শনিক ব্যাটাগুলা এত কঠিন কঠিন ভাষায় বলে, আমার কাছে ইউজলেস লাগে। অন্যদের কাছে শুনার পর আমি দার্শনিকদের কথায় ভুল ধরি। আর ওরা আমারে পঁচায়। বলে—সারফেস লেভেলের জ্ঞান দিয়ে এত পণ্ডিতি দেখাইস না। উনাদের বইগুলা মন দিয়া পড়, তারপর পণ্ডিতি করিস। এই কথা শোনার পর থেকে এইসব

অ্যাসাইনমেন্টের দিনে আর মিটিং অ্যাটেন্ড করি না। যেদিন সিনিয়ররা খালি নাস্তা খাওয়ায়, শুধু ওইদিন যাই।"

"তো আজকেও কি নাস্তা খাওয়ার ডেট নাকি?"
"জানি না। গিয়ে দেখি কী হয়।"

"আরে, ম্যাডাম! কতদিন পর!" সন্ধানীর দিকে তাকিয়ে বলল লম্বা-চওড়া একটা ছেলে।

সন্ধানী সবার সাথে হাই-হ্যালো করছে। আর একদিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ইলমা। অস্পষ্ট করে শুনতে পেল সন্ধানী একজনকে আস্তে করে বলছে, "আমার ডিপার্টমেন্টের ফ্রেন্ড।"
অন্যজন আরও নিচু গলায় সন্ধানীকে জিজ্ঞেস করল, "ফ্রিথিংকার?"
সন্ধানীও নিচু গলায় বলল, "ফ্রিথিংকার না, তবে অত ধার্মিকও না। মুসলমান ফ্যামিলির।"
"ওহ। আচ্ছা ব্যাপার না।"

একজন একজন করে সংঘের সবাই পরিচিত হয়ে নিল ইলমার সাথে। মামুন নামের ছেলেটা বলল, "Make yourself feel at home."

ইলমার ভালোই লাগছে। প্রায় সবাই সিনিয়র হলেও বেশ ফ্রেন্ডলি। ব্যাচমেটরাও আন্তরিক। বিশেষ করে ফিজিক্সের কানিজ আর বায়োকেমিস্ট্রির নাবিলা। খালি সবাই কথায় কথায় গালাগালিটা একটু বেশি করে আরকি। নির্দোষ গালাগালি।

"এটাই তা হলে সেই বিখ্যাত গাঞ্জা চত্বর ওরফে সবুজ সরণি।" ভাবল ইলমা।

আগেও দু-একবার এখান দিয়ে আসা-যাওয়া করেছে, তবে পাঠচক্রের সময় না হওয়ায় তখন জায়গাটা নীরব ছিল। সিমেন্ট দিয়ে বানানো বসার জায়গায় গোল হয়ে বসে আছে পনেরো জনের মতো।

"রাশেদ ভাইয়ারা কই, মামুন ভাই?" সন্ধানীর জিজ্ঞাসা।
"আজকে আসতে পারবে না, দ্যুতি আপুও না। গ্রুপে পোস্ট দিছিল। দেখিস নাই?"
"না, ভাই। এই পুরা ভ্যাকেশনে আর গ্রুপে ঢোকার সুযোগ হয় নাই।"
"আজকে আমি ভারপ্রাপ্ত সঞ্চালক।"
"অনেক ভার, তাই না মামুন ভাই?" নাবিলা বলল।
"হুমমম। ভারে একদম ঘাড়ব্যথা করতেছে... ও! সন্ধানী তো মনে হয় তাইলে আজকের টপিকও জানিস না।"
সন্ধানী এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল।
"আজকে একেকজন একেক ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করে আসার কথা।"
আরেকজন সিনিয়র ভাই বলল, "ধর্মগুলার পরস্পরবিরোধী দুইটা এলিমেন্ট নিয়ে কথা বলবে প্রত্যেকে।" অন্যদের মুখ থেকে ইলমা জানতে পেরেছে তার নাম প্রদীপ।
"তোর তো প্রস্তুতি নাই মনে হয়?" বলল মামুন ভাই।

ইলমা কৌতূহল নিয়ে সন্ধানীর দিকে তাকাল। সন্ধানী ঠোঁট উলটে আবারও ডানে-বামে মাথা নাড়ল।
“ব্যাপার না,” প্রদীপ দা’ বলল, “তোর হিন্দুইজম নিয়েই কিছু বলিস।”

“ওকে সাইলেন্স!” নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকা কয়েকজনকে থামাল মামুন ভাই, “রুলস শোন সবাই। প্রত্যেকে সর্বোচ্চ তিন মিনিট কথা বলতে পারবি। সবার বলা শেষ হলে ফিডব্যাক সেশন হবে। কার বক্তব্যে কী কী লজিক্যাল ফ্যালাসি ছিল, সেগুলাই শুধু ফিডব্যাক সেশনে আসবে। কে কী ঠিক কথা বলসে, সেগুলা নিয়ে কোনো প্রশংসা করা যাবে না। আমার বাম দিক থেকে একজন একজন করে বলা শুরু করবে সিরিয়াল অনুযায়ী। রেডি?”

ইলমা উসখুস করতে শুরু করল। একবার চুল ঠিক করছে। একবার হাতের আংটিটা ঘোরাচ্ছে। পার্স থেকে ফোন বের করে লক খুলে আবার লক করছে। ইন্টারনেটে ধর্ম নিয়ে ক্যাঁচাল এমনিতেই এড়িয়ে চলে সে। মাঝে মাঝে মন ভালো থাকলে নামাজ-কালাম পড়ে, রমজানে রোজা রাখে। এখন নিজের ধর্মের সমালোচনা শোনা লাগবে, এটা সহজভাবে নিতে পারছে না সে।

সন্ধানী সম্ভবত বিষয়টা খেয়াল করল। বলল, “মামুন ভাই, আমার ফ্রেন্ড তো লাঞ্চের পরপর ভার্সিটির বাসে বাসায় যাবে। আমার স্লটটা পারলে একটু আগায়ে দিয়েন।”
“আমার টাইম আছে, সমস্যা নেই।” ইলমা বলতে নিল।
মামুন ভাই বলল, “না, না, শুনো। তোমার এই বান্ধবি এমনিতেই ফাঁকিবাজ।” সন্ধানীর দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, “কিন্তু কারও কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করা আমাদের স্বভাব না। সন্ধানী, তুই আগে কাজ শেষ করে ওকে নিয়ে চলে যা। এরপর আবার আমার বাম দিক থেকে সিরিয়াল বাই আলোচনা শুরু হবে। সন্ধানী, স্টার্ট।”

পাঠচক্রের রুলস অনুযায়ী কোনো ভণিতা না করেই সরাসরি বক্তব্যে চলে গেল সন্ধানী, “ওকে। অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা আর সমঅধিকার। এই দুইটাকে এই যুগে একদম **axiomatic truth** ধরা হয়। অথচ এই দুইটা একদমই পরস্পরবিরোধী। অ্যাবসোলিউট সেন্সে কখনোই এই দুইটা জিনিস একসাথে প্রয়োগ করা যাবে না। সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হলে তাদের অবাধ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা লাগবে, যারা অন্যদের চেয়ে কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে আগায়ে আছে। ধরেন, বড়োলোক। বর্তমান পুঁজিবাদী সিস্টেমে তাদের টাকা খরচ করার স্বাধীনতায় যদি বাধা দেয়া না হয়, তারা অলওয়েজ গরিবদের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করবে। আবার পরীক্ষার হলে সবাইকে সমান অধিকার দিতে গেলে মুসলমান মেয়েরা হিজাব পরার অধিকার হারাবে, কারণ ভিতরে ইয়ারফোন থাকতে পারে। এইরকম অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায় অবাধ স্বাধীনতা আর সমান অধিকার একটা আরেকটার সাথে কনট্রাডিক্ট করে।”

কথা শেষ করে মামুন ভাইয়ের দিকে তাকাল সন্ধানী। ইলমা খুবই অবাক হয়ে গেছে। ধর্মের পরস্পরবিরোধী এলিমেন্ট নিয়ে আলোচনা বলতে সে অন্য কিছু বুঝেছিল। অন্য সবার চেহারায় রাগ আর বিরক্তি দেখে বুঝল অন্যেরাও তা-ই ভাবছিল।

"দুই পাতা হারারি পইড়া আইসা এখন পণ্ডিতি কড়াইতেছে।" এক সিনিয়র ভাই বলল, যার নাম ইলমা ভুলে গেছে।
"ধর্ম নিয়া আলাপ করার কথা। সে কোন ধর্মের এলিমেন্টস নিয়া কথা বলল, সেটাই তো বুঝলাম না।" বলল আরেক আপু, ক্যামেলিয়া না কী যেন নাম।
"লিবারেল হিউম্যানিজম!" কণ্ঠ উঁচু করে বলল সন্ধানী।
মামুন ভাই বলল, "এইটা কি ধর্ম?"
সন্ধানী আরও জোরে বলল, "এইখানে আপনাদের মধ্যে কমপক্ষে দশজনের এফবিতে রিলিজাস ভিউর জায়গায় হিউম্যানিজম লেখা আছে।"
"এই তো হুদাই ত্যানা প্যাঁচাইতে শুরু করলি।" মামুন ভাই আবার বলল, "কীসের সাথে কী মিলাস?"

সন্ধানী চটে যাচ্ছে। তার এই চটে যাওয়াটাই ভয় লাগে ইলমার কাছে। সন্ধানী ভুল কী বলেছে, তা বুঝতে পারছে না ইলমা। কিন্তু এত স্বল্পপরিচিত কয়েকজন মানুষের মাঝে কিছু বলার সাহসও পাচ্ছে না।

ইলমার হাত খামচে ধরে তাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সন্ধানী। বলল, "You know what? রাশেদ ভাইদের মতো আপনারা কেউই আসলে খোলামেলা চিন্তা করতে পারেন না। এজন্যই ওনারা দুইজন ছাড়া বাকিদের সাথে আমার ঝগড়া লাগে। এইজন্যই আমি আসতে চাই না।"

একটা রিকশা ডাক দিয়ে ইলমাকে নিয়ে হলের দিকে রওনা দিল সন্ধানী। সন্ধানীর সাথে কাটানো বাকিটা সময়ে এ নিয়ে আর একটা কথা তোলারও সাহস হল না ইলমার।

জন্মই আজন্ম পাপ

সন্ধানী সেন published a note: The Original Sin
18 October 2015 · 7:25 PM · Public

সুঠাম দার্শনিক ভিত্তি তৈরি না করে শাখা-প্রশাখা নিয়ে আবেগী আলাপ করলে প্রতিপক্ষের সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারবেন না। আগে দার্শনিক ফাঁকফোঁকরগুলো বন্ধ করার দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ধর্ম আমাদের যে নৈতিক মানদণ্ড দিত, নাস্তিক হওয়ার পর থেকে এই শূন্যস্থানটা পূরণ করতে আমাদের বেশ মাথা খাটাতে হচ্ছে। এটা আমি পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে বলছি না, বাস্তবতা স্বীকার করছি যাতে ভেবেচিন্তে এর সমাধান বের করা যায়।

আমার অধার্মিক সতীর্থরা প্রায়ই এখানে দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে মানবতাকে সামনে নিয়ে আসেন। ফাইন। বিশ্বাসের জায়গা থেকে বিজ্ঞানও আমাদের কাছে প্রায় একইরকম গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু অধার্মিক সতীর্থ ভাই-বোনেরা! বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ হওয়ার মধ্যে স্পেশাল কী আছে, তা তো আজ পর্যন্ত আপনারা কেউ আমাকে একটু কড়া যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বোঝালেন

না। একটা না একটা পর্যায়ে গিয়ে আলোচনা বিজ্ঞান ছেড়ে ওই আবেগের দিকেই চলে আসে। **Human life form** আর একটা **dog life form**-এর মধ্যে অবজেকটিভ পার্থক্যটা আসলে কী? বিবর্তনের ধারায় একটা একটু এগিয়ে আছে, আরেকটা পিছিয়ে আছে। এই তো? **But does it make us really special?** কুকুরের কামড়ে একটা মানুষের যেন জলাতঙ্ক না হয়, এই উদ্দেশ্যে একটা কুকুরকে ভ্যাক্সিন দিয়ে দিলেন। কিন্তু কুকুরের পেটে কোনো মানুষ যাতে লাথি না মারে, এ জন্য মানুষের পা-টা কাটবে কে? গরু খাওয়ার অপরাধে মানুষ হত্যা করলে ন্যায়বিচার না হলো, কিন্তু সমপরিমাণ প্রতিশোধ তো হলো, নাকি? প্রাণের বদলে প্রাণ!

গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি সবাইই মানুষের জন্য জীবন দিচ্ছে। এই কাজগুলো করার একটা নৈতিক ভিত্তি আমাকে সায়েন্স দিয়ে দেখান, এথিক্স দিয়ে না।

আলাপটা এখানেই শেষ হয়ে গেলে কোনো সমস্যা ছিল না। **Metacognitive** ক্ষমতা দিয়ে এই স্বার্থপর জগতে আমরা সুবিধা নিচ্ছি, ভালো কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, **Anti-Natalism** এই আলাপটাকে আর এত নিরপেক্ষ থাকতে দেয় নাই। যারা জানেন না, তাদের জন্য উইকিপিডিয়া থেকে নিজের ভাষায় লিখছি। **Anti-Natalism** হলো একটা দার্শনিক মত, যা 'জন্ম'কে নেতিবাচক চোখে দেখে। মানুষের বংশবৃদ্ধি নৈতিকভাবে খারাপ, এমনকি কারও কারও মতে পশুপাখির বংশবিস্তারও অনৈতিক। দুঃখের ব্যাপার কী জানেন? এই দাবিটা প্রচণ্ড সায়েন্টিফিক, বস্তুবাদী এবং নৈর্ব্যক্তিক। এর সমর্থকরা সবাই অধার্মিক। ধর্মপন্থীদের পক্ষে **Anti-Natalist** হওয়া সম্ভব না। প্রায় সব ধর্মেই গডের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে মানুষের আলাদা মর্যাদা আছে। প্রায় সব ধর্মেই বংশবিস্তার একটা পবিত্র দায়িত্ব (কিছু pagan ধর্ম বাদে, যেগুলার অনুসারী সংখ্যা নগণ্য)।

জন্মগ্রহণকে কেন এনারা খারাপ মনে করে, তা একটু সহজ-কঠিন ভাষায় বলি। সহজ করে বললে, পৃথিবীটা একটা দুঃখ-কষ্টের জায়গা। আমরা এখানে শুধু শুধুই ন্যায় আর অর্থ (**meaning**) খুঁজে ফিরি। এর মধ্যে নতুন একটা মানুষকে জন্ম দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তাকে এই দুঃখ-কষ্টের জীবনে আসতে বাধ্য করা। তাই সমাধান হলো বংশবিস্তার বন্ধ করে দিয়ে মানবজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। টিং টিং টি টিং! জন্মই আমার আজন্ম পাপ, এইটা শুধু ক্রিশ্চিয়ানরাই দাবি করে না তা হলে। নিরীশ্বরবাদেরও একটা **Original Sin** আছে! আদিপাপ। জগতে এত দুঃখ-কষ্ট কেন, এই যুক্তি দিয়ে আগে আমরা ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করতাম। এখন দেখি আমার নিজের অস্তিত্বই হুমকির মুখে!

এই জিনিসটাকেই আরেকটু কঠিন করে কয়েকভাবে বলা যায়:

Kantian Imperative: দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট-কে তো চিনেন মনে হয় সবাই। তাঁর মতে, মানুষকে কোনো উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর মাধ্যম বানানো যাবে না, সে নিজেই লক্ষ্য, নিজেই উদ্দেশ্য। কিন্তু পিতামাতা যেহেতু সন্তানকে জন্ম দেয় নিজেদের স্বার্থে, তাই সন্তান একটা মাধ্যমে পরিণত হলো। আর তাই **Anti-Natalist**-দের মতে এখানে কান্টের ইম্পেরাটিভ ব্যাহত হচ্ছে।

সম্মতি নেওয়া অসম্ভব: বাচ্চা জন্ম দেওয়ার সময় তার থেকে সম্মতি নেওয়া সম্ভব না যে, সে পৃথিবীতে আসতে চায় নাকি চায় না। বংশবিস্তার-প্রক্রিয়া তাই ব্যক্তিস্বাধীনতার লঙ্ঘন। অস্তিত্ব আর জীবনযাপনের যেই কষ্ট, এ সম্পর্কে একটা বাচ্চাকে জন্মের আগেই জানানো গেলে সম্ভবত সে আর জন্ম নিতে চাইবে না। অস্তিত্ব যদি 'নিশ্চিত' বিপদ-আপদের সমষ্টি না-ও হয়, তারপরও **Anti-Natalism**-কে সঠিক অবস্থান বলা সম্ভব। কারণ একটা মানুষকে তার সম্মতি ছাড়া 'সম্ভাব্য' বিপদ-আপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার কোনো নৈতিক অধিকারও আপনার নেই।

নেতি-উপযোগবাদ: **Utilitarianism**-এর মূল কথা হলো সর্বোচ্চ সুখ আস্বাদন। **Negative Utilitarianism** এর দাবি, সুখ বাড়ানোর চেয়ে দুঃখ-কষ্টের পরিমাণ সর্বনিম্নতে নামিয়ে আনার নৈতিক গুরুত্ব বেশি। একটা টেবিল দেখেন:

অবস্থা	বাচ্চা জন্ম দিলেন	বাচ্চা জন্ম দিলেন না
বাচ্চা যদি জীবনে সুখী হয়	কোনো দায়িত্ব পালন বা লঙ্ঘন করেন নাই	দায়িত্ব লঙ্ঘন করেন নাই
বাচ্চা যদি জীবনে অসুখী হয়	দায়িত্ব লঙ্ঘন করেছেন	দায়িত্ব পালন করেছেন

এইখান থেকে দেখা যায় যে, যত যা-ই করেন, বাচ্চা জন্ম না দিলেই নৈতিক দায়িত্ব সবচেয়ে ভালোভাবে রক্ষিত হচ্ছে!

David Benatar আরেকভাবে ছকটা দেখিয়েছেন। প্রথমে চারটা বিষয় বোঝেন:
১। দুঃখের উপস্থিতি খারাপ।
২। সুখের উপস্থিতি ভালো।
৩। দুঃখের অনুপস্থিতি ভালো, যদিও কেউ সুখে না থাকে।
৪। সুখের অনুপস্থিতি খারাপ না, যদি না কাউকে জোর করে বঞ্চিত করা হয়।

এবার:

আপনার অস্তিত্ব আছে	আপনার অস্তিত্ব নেই
(১) দুঃখে আছেন (খারাপ)	(৩) দুঃখে নেই (ভালো)
(২) সুখে আছেন (ভালো)	(৪) সুখে নেই (খারাপ না)

তার মানে জন্ম নিলে হয় ভালো নাহয় খারাপ, জন্ম না নিলে হয় ভালো নাহয় খারাপ না। অসমতাটা খেয়াল করেন। দুঃখী মানুষ জন্ম দেওয়ার অধিকার আমাদের নাই, সুখী মানুষ জন্ম দেওয়ার কোনো দায়িত্বও নাই। এবার চিন্তা করেন বংশবিস্তার করবেন কি করবেন না।

পরিবেশের উপর খারাপ প্রভাব: দুনিয়ার তাবৎ পরিবেশ দূষণ যে মানুষের দ্বারাই হয়, তা তো আর পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝানোর দরকার নেই। উদ্ভিদ আর প্রাণী, সবার জন্যই মানুষ ক্ষতিকর। তাই পরিবেশ রক্ষার্থে মানবজাতির স্বেচ্ছাবিলুপ্তি প্রোমোট করার জন্য একটা সংগঠনও কাজ করে যাচ্ছে সেই ১৯৯১ সাল থেকে। নাম **Voluntary Human Extinction**

Movement (VHEMT)। মানুষের যৌনাকাঙ্ক্ষা **natural**, কিন্তু সন্তান জন্ম দেওয়ার বাধ্যবাধকতা **cultural**। এই কালচার পালটে নতুন কালচার আনলেই পরিবেশ দূষণ সমস্যা **solved**!

অবশ্য ভিন্ন দিকও আছে। মানুষের চেয়ে বনজঙ্গলের পশুপাখি আর পানির নিচের মাছের জীবনযাপন কিন্তু আরও খারাপ। জীবাণু, রোগবালাই, ভিন্ন বা একই প্রজাতির হাতে মারা পড়া, বাপ সন্তানকে খেয়ে ফেলা—সব মিলিয়ে পশুপাখিরা আরও কষ্টে আছে। তাই **Anti-Natalist** দের একটা অংশ পশুপাখিদেরও বিলুপ্তির পক্ষে। নেন, এইবার ১০০% পরিবেশ সুরক্ষা। আমি নিজে গাছপালা খুব ভালোবাসি, তবে এনাদের মতো এত উন্নতমানের পরিবেশবাদী চিন্তা আমি নিজেও করি নাই আগে।

এখন আমাকে বলেন এতকিছুর পরও 'মানবজাতির কল্যাণ' কীভাবে ধার্মিকদের বিরুদ্ধে তর্কে আমাদের অস্ত্র হয়, যেখানে মানবজাতির অস্তিত্বই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটা ক্ষতিকর ফেনোমেনন।

Riad Hasan and 201 others reacted
Like · 12 shares

Comments:

Riad Hasan: মাথা ঘুরান্টিস।
Like · Reply · 5h

Saiful Islam: Nice writing. Btw, imperative er ekta line e 'shontan re' word ta 2bar asce.
Like · Reply · 5h

সন্ধানী সেন: Thanks. Edited.
Like · Reply · 4h

Dreamboy Sohag: ঝগড়া দেখতাম আইছি।
Like · Reply · 5h

সন্ধানী সেন: Ja vag.
Like · Reply · 4h

Dreamboy Sohag: চ্যাস ক্যারে? আমি তোদের মত ইন্টেলেকচুয়াল না দেইখা?
Like · Reply · 5h

Kaniz Labonno: *লের যুক্তি। কোটি কোটি বছর নরকে থাকা লাগবে জাইনাও ধার্মিকরা বাচ্চা লয় ক্যান ওইটা জিগা।
Like · Reply · 5h

জান্নাতুল ফেরদৌস নাবিলা: LOL. আসলেই। পুরাই লেইম।
Like · Reply · 5h

সন্ধানী সেন: কারণ ওদের পোলামাইয়ারা নরকে যাবে না আমাদের মত।
Like · Reply · 5h

Rebellious Faysal: সুন্দর লেখা পড়লাম আধা নাস্তিক আফা। যথারীতি উইকি থিকা চুরি।
Like · Reply · 5h

সন্ধানী সেন: চুরি হইত যদি সোর্স উল্লেখ না করতাম আজাদ সাবের মতো।
Like · Reply · 5h

ইলমা: অস্থির! এরা তো তাহলে মনে হয় প্রো-এবোর্শনিস্ট এবং সুইসাইডাল?
Like · Reply · 5h

সন্ধানী সেন: উঁহু। এবোর্শন যেহেতু অলরেডি অস্তিত্বমান প্রাণ হত্যা তাই তারা এবোর্শনেরও বিরোধী। তবে সন্তান দত্তক নেওয়াকে জন্মদানের আপাতত বিকল্প বলেন উনারা। আর আত্মহত্যাও তাদের মতে খারাপ। **VHEMT** এর স্লোগান হল **May we live long and die out.**
Like · Reply · 5h

সংশয়ে সংশয়

"একেক বিজ্ঞানী একেক কথা বলে। কারটা মানবো?"

সন্ধানীর কথার কোনো জবাব দিতে ইচ্ছে করছে না কানিজের। ক্যাম্পাসের এই মুক্ত-প্রাণবন্ত পরিবেশে সন্ধানীর অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা বড়ো বেখাপ্পা ঠেকছে। বই-ব্লগ-ফেসবুক ঘেঁটে বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে দু-চারটা আর্টিকেল পড়েছে কদিন ধরে। সেগুলোই মাথা খেয়েছে তার।

সন্ধানী বলে চলেছে, "এক বিজ্ঞানীর মরার একশো বছর পর প্রমাণ হয় তার থিওরি ভুল। কারও থিওরি নিয়া জীবিতদের মধ্যেই হাজারটা ডিবেট।"

"হ্যাঁ রে, ভাই।" বিরক্ত ভঙ্গিতে কানিজ বলল, "এইটাই সায়েন্সের দর্শন। শেষ বলে কোনো কিছুই নাই। স্কুলের পাঠ্যবইয়ে বাইবেল মনে করে যেসব থিওরি পড়সি, ওইগুলাও আসলে বাইবেল না। অন্য কোনো বিজ্ঞানী আইসা সেগুলাকে চ্যালেঞ্জ করতেই পারে।"

"আর বিশেষজ্ঞ-মহলে একটা গবেষণার ফলাফল যেভাবে বাইর হয়, সাধারণ মানুষের সামনে তার চেয়ে সিম্প্লিফাইড করে তুইলা ধরা হয়?" সন্ধানীর জিজ্ঞাসা।

"হুম। ইভেন কতটুকু তুলে ধরা হবে, এটা নিয়ে সায়েন্টিস্টদের মধ্যে আলোচনা হয়। মিটিং হয়। তারপর যা প্রকাশ করা হয়, সেইটা পত্রিকায় আরও সিম্প্লিফাই করে ছাপায়। ইংরেজি পত্রিকা থেকে বাংলায় অনুবাদ হওয়ার সময় আরও সিম্প্লিফাইড হয়। তোরা নন-সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষেরা এভাবে করে কখনোই আসলে মূল গবেষণার ছিটাফোঁটাও জানতে পারবি না। আমরাই পারি না অনেক সময়।"

"আচ্ছা, বিজ্ঞান একটা সময় সমকামিতাকে আননেচারাল বলত। এখন নেচারাল বলে। এইটার কারণটা কী?"

"শোন," কানিজ এখনও বিরক্ত, "বিজ্ঞান কিছু বলে না। বিজ্ঞানীরা বলে। আর তারা অনেক সময়ই স্পন্সরদের পক্ষে কথা বলে। বিজ্ঞানের বেশিরভাগ উন্নতি হয় যুদ্ধের সময়। কেন? কারণ তখন নেতারা বিজ্ঞানীদের টাকা দেয় অস্ত্র বানাইতে। আবার সোশাল প্রেশারের কারণে অনেক গবেষণার ফল ভিন্নরকম হয়। এই মিলেনিয়ামের আগে খ্রিস্টান পাদরিদের চাপে বিজ্ঞানীরা সমকামিতাকে মানসিক বিকৃতি বলতে বাধ্য হইসিলেন। এখন সেইসব বাধা আর নাই। তাই তারা সঠিকটা বলসেন।"

"তাই? এখন যে উনারা লিবারেল সেক্যুলারিস্টদের চাপে ভুল বলতেসেন না, এই পয়েন্টটাকে কীভাবে স্কিপ করে যাব?"

"এখন বিজ্ঞান আগের চেয়ে অনেক উন্নত। হোমোসেক্সুয়ালিটি যে জেনেটিক, এইটার পক্ষে অনেক প্রমাণ আছে।" কেমন দায়সারা শোনাল কানিজের কণ্ঠ।

"ওকে, মানলাম। কিন্তু কোনো-না-কোনো অথোরিটির চাপে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এদিক-ওইদিক হয়, এইটা তো সত্যি। নাকি?"

"হয় মাঝে মাঝে।"

সন্ধানী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, "যা-ই হোক! এত কাছের ফ্রেন্ড হয়ে তোরা এই বিষয়গুলা এতদিন আমার সাথে আলাপ করিস নাই। আমাকে জানাস নাই। এখানেই দুঃখটা।"

কানিজ মনে মনে জবাব গোছাতে গোছাতেই সন্ধানী আবার বলল, "ভয় হয় বুঝলি কানিজ, এই ছোট্ট জীবনে এত কনফিউশনের ভিতর থেকে সত্যটা বাইর করে নিতে পারব কি না, কে জানে!"

কানিজ বলল, "না-পেলে না পাইলি! তাতে আর কী আসে যায়? মইরা গেলে সব শেষ।"

"যদি সব শেষ না হয়, তখন?"

"তখন আল্লাহ, গড, ঈশ্বরকে বলিস—উনাকে বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না তোর কাছে।"

জিদ লাগল সন্ধানীর। কানিজ যে নিজেই নিজের বিশ্বাসে অটল না, কথার ফাঁকে সেটা টের পেয়ে যায় সন্ধানী। একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে গেল সে, "সেকেন্ড ইয়ারে একটা নাটক নামাব আমরা। *Absurdist* থিয়েটারের। *Absurdist philosophy* জানিস তো, নাকি?"

"হুম," খুশি হয়ে উঠল কানিজ, "জোস হবে তা হলে। কোন নাটক?"

"*সিসিফাস মিথ* নিয়ে একটা নাটক..... তা হলে তো এগুলার মূল কথা জানিসই তুই," বলে চলল সন্ধানী, "কেন এই দুনিয়ায় আসলাম? কোথায় যাব? কেন বেঁচে আছি? কেন ভার্সিটিতে পড়ছি? মৃত্যুই যদি শেষ কথা হয়, তবে আত্মহত্যা করা যাবে না কেন? *Absurd* এই জগতের বাইরে সত্যিই কি কোনো মহাশক্তিধর সত্তা আছে, যার কারণে এই অর্থহীন পৃথিবী অর্থপূর্ণ হয়? বল তো, নাস্তিকদের কাছে সত্যিই কি এগুলার কোনো জবাব আছে?"

হাসার চেষ্টা করল কানিজ, "জীবনটা অর্থহীন, তাই তুই এর উপর নিজের ইচ্ছামতো অর্থ আরোপ করবি। *Absurd*-এর সবচেয়ে সুন্দর দিক তো এটাই, নাকি?"

"হুম," দীর্ঘশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল সন্ধানী, "হয়তো আমি আবার ধার্মিক হয়ে যাব রে।"

মুখ বাঁকাল কানিজ, "তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু এত এত ধর্মের মধ্যে কোনটা ঠিক, সেটা কীভাবে বের করবি, শুনি?"

"একটা একটা করে বাদ দিতে দিতে সামনে আগাব। আজ যেমন নাস্তিকতা নামের ধর্মটা বাদ দিলাম, এভাবেই একটু একটু করে যাইতে থাকব সামনের দিকে। শেষমেশ কিছু না পাইলে *deist* হয়েই থাকব, কিন্তু *atheist* না।"

অনেকক্ষণ নীরবতার পর সন্ধানী হোস্টেলে ফেরার জন্য উঠল, "যাই রে।" কিছু বলল না কানিজ। একটু দূর গিয়ে পেছন ফিরে সন্ধানী বলল, "কানিজ, শোন। ঠাকুমা আমার নাম রাখসেন সন্ধানী। সন্ধানী মানে যে সত্যকে খুঁজে বেড়ায়। দেখিস, আমি এই নামের সার্থকতা রাখবোই।" বলে আবার হাঁটা দিল সে।

তাকিয়ে ছিল কানিজ। সন্ধ্যার আজানের শব্দে যেন হুঁশ ফিরল ওর। রাত তার ডানাগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঘনিয়ে আসছে অপ্রিয় একটা বাস্তবতার সময়, যা সে ছাড়া কেউ জানে না। আগত ১০-১১ ঘণ্টা আস্তিক থাকবে সে। রাতের ছমছমে পরিবেশটা কেটে গিয়ে আবার যখন সূর্য আলো ছড়াবে, পাখি গাইবে গান, মানুষের পদভারে গমগম করবে শহর, তখন সে আবার ফিরে আসবে প্রিয় নাস্তিকতায়। প্রশান্তির দায়িত্বহীনতায়।

কৃতজ্ঞতা

২১শে ফেব্রুয়ারির বন্ধের সাথে শুক্র-শনিবার মিলে না যাওয়ায় আর বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। মেজাজ এমনিতেই খিঁচড়ে আছে। ডেস্কটপের সামনে বসে ইউটিউবে এলোপাথাড়ি হিন্দি গান চষে বেড়াচ্ছিল সন্ধানী। এমন সময় টের পেল যে, দরজা খুলে রুমে ঢুকেছে রেবা আর চারু—তার তিন রুমমেটের মধ্যে দুজন। আরেকজন রুমমেট আছে ওর, নাম শর্মিষ্ঠা। সে অবশ্য এখনও বাইরে। চোরের ভঙ্গিতে আস্তে করে ইউটিউবের ট্যাবটা বন্ধ করে দিল সন্ধানী। এমনিতেই প্রভাতফেরিতে যায়নি ও, এখন আবার শুনছে হিন্দি গান। রাত ১২টা ১ মিনিটের বদলে ভোরেই প্রভাতফেরি হয় ওদের ভার্সিটিতে।

কানে ইয়ারফোন থাকায় সন্ধানী ঠিক বুঝতে পারছিল না রুমমেটরা এখনও কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কেন। একটু পর রেবা এসে তার দু-কান থেকে ইয়ারফোন খুলে নিল। সন্ধানী মানসিকভাবে প্রস্তুত হলো ওদের ঘ্যানঘ্যান সহ্য করার জন্য। তাকিয়ে দেখল চারুর হাতে পানির বোতল। গায়ে ঢেলে দেবে ভেবে সতর্ক হলো। একটি হাত মুখের কাছে মাইকের মতো ধরে অদৃশ্য দর্শকদের উদ্দেশ্যে রেবা বলতে লাগল, "প্রিয় দেশবাসী, চারুর সর্বোচ্চ ঘুমের রেকর্ড ভেঙে দিয়ে 'ঘুমকুমারী' অ্যাওয়ার্ডের এ বছরের নতুন বিজয়ী... সন্ধানীইই সেন!"

অ্যাওয়ার্ড প্রদানের ভঙ্গিতে বোতলটা সন্ধানীর হাতে তুলে দিল চারু। রেবা হাততালি দিতে লাগল। সন্ধানী বোতলটা নিয়ে বিরক্ত ভঙ্গিতে আছাড় মেরে রেখে দিল টেবিলের উপর। বলল, "তো.... কী অবস্থা? কেমন এনজয় করলি প্রভাতফেরি?"

"তোর বলব কেন? তুই তো একটা রাজাকার।" খুনশুটি করল চারু, "ভাষার প্রতি কোনো ভালোবাসা নাই তোর!"

সন্ধানী কিছু বলার সুযোগ খুঁজছে। রেবা বলল, "ঠিক। শাস্তি হিসেবে তোকে আজকে সারাদিন বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে হবে। কোনো ইংলিশ ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবি না।"

"তুই যে করলি এখন?" সন্ধানীর অভিযোগ।

"ও তো আর শাস্তির আওতায় নাই।" বলল চারু।

"শোন, আমি ভাষাপ্রেমীও, আবার গাছপ্রেমীও।" সন্ধানী বলল।

রেবা মুখ ঝামটা দিল, "ক্যান? শহীদমিনারে গেলে কি তোর টবের সব গাছ্ মইরা যাইত?"

"ইতিহাস শোন..."

"কোনো বিকৃত ইতিহাস শুনাবি না।"

"আরে ছাতা! আমার নিজের জীবনের ইতিহাস। অনেক পিচ্চিকালে বাবার ঘাড়ে চড়ে ফুল দিতে গেছিলাম শহীদমিনারে। প্রায় বিকালের দিকে। এর একটু পরই দেখি পৌরসভার ময়লার ট্রাক আইসা ফুলগুলা তুইলা নিয়া যাচ্ছে। তোদের দেওয়া ফুলেরও একই দশা হবে, দেখিস। এত সুন্দর সুন্দর ফুলগুলা আমি ময়লার ট্রাকে দেখতে রাজি না, বুঝছিস?... আর, আর টোকাইরা সেখান থেকে ফুলটুল নিতে আসলে পুলিশরা এমন পিটনা দেয়, দেখলেই কান্না আসে।"

অন্য দুজন পাত্তা না দেবার ভঙ্গিতে নিজ নিজ কাজ করতে লাগল। বাইরে যাবার প্রস্তুতি নিতে নিতে সন্ধানী বলল, "শর্মি যায় নাই তোদের সাথে?"

চারু বলল, "ওর ডিপার্টমেন্টে প্রোগ্রাম আছে নাকি। ওইখানে গেছে। তুই আবার কই যাস? আজাদ সংঘে?"

"আরে নাহ! গণরুমে থাকাকালে ওইখানে টাইম পাস করতে যেতাম। এখন গিয়া আর কী করব। একটু ডিপার্টমেন্টের দিকে যাই। পুরা আর্টস ফ্যাকাল্টির একটা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম আছে। ইলমা ফোন দিছিল, সেও নাকি যাবে।"

অনুষদ ভবনের সেমিনার রুমে ঢুকে সন্ধানী বুঝল—বেশি আগে চলে এসেছে। গানবাজনা-নাটক, কিছুই শুরু হয়নি এখনও। আলোচনা-সভা চলছে। ক্লাসের পেছনের দিকে একটা চেয়ারে বসে ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা দিতে লাগল। এমন সময় পেছন থেকে শোনা গেল ইলমার কণ্ঠ, "অ্যাই, তোরা কেউ স্পিচ দিবি?"

"না!" সবাই একসাথে বলে উঠল।

খুবই অসহায় দেখাল উপস্থাপিকার-সাজে-সজ্জিত ইলমাকে, “আয় না কেউ! আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে কেউ না আসলে আমাকে ঝাড়ি খাইতে হবে।”

রিয়াদ বলল, “তুই-ই তো আছিস আমাদের প্রতিনিধি হয়ে।”

“একজন আয় না, বাবা।” ইলমা নাছোড়, “এই.... বাঙালি হতে পেরে গর্বিত, ভাষাশহীদদের জন্য গর্বিত—এইসব হাবিজাবি কিছু কথা বলে নেমে যাবি, আয় আয়।”

রোকেয়া বলল, “সিনিয়রদের ডাকতেছিস ক্যান? ফার্স্ট ইয়ারের কাউকে ধইরা নিলেই তো হয়।”

ইলমাকে দেখে মনে হলো এখনই কেঁদে ফেলবে, “ফার্স্ট ইয়ারের সবারই কালচারাল প্রোগ্রামে কোনো-না-কোনো পারফরম্যান্স আছে। রিহার্সাল করতেছে ওরা। প্লিজ, দোস্ত! এই বক্তৃতাটার পরেই আমাদের বিভাগের কোনো একজনকে লাগবে। এমন করিস না তোরা। একজন আয় না... এই সন্ধানী! তুই চল, প্লিজ।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ! এইটা ভালো আইডিয়া।” দশ-বারোজনের ছোটো গ্রুপটার সবাই একসাথে বলে উঠল। বলার সময় মনে হলো যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ওরা।

সন্ধানী যে খুব অরাজি, তা নয়। তারপরও কিছুক্ষণ ভদ্রতাসূচক অনিচ্ছা দেখাল।

ফারুক সন্ধানীকে বলল, “দ্যাখ, কাউকে-না-কাউকে স্যারদের ঝাড়ি খাওয়াই লাগবে। হয় ফাউল বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমাদের কেউ খাবে, আর নাইলে বক্তৃতা না দেয়ার জন্য ইলমা খাবে। এখন তুই ভালো স্পিচ দিতে পারলে সবাইই বাঁইচা গেল, আর আউলফাউল স্পিচ দিলেও তোর মতো ঝগড়াইট্যাকে কোনো স্যারম্যাডাম ঝাড়ি দিতে আসবে না।”

“তোদের মতো গাদ্দারদের সাথে আসলেই ফ্রেন্ডশিপ করা ঠিক হয় নাই। বিদায় পৃথিবী!” বলতে বলতে ইলমার সাথে উঠে এল সন্ধানী। ইলমা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দুজনে স্টেজের পাশে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে রইল। তখন উজ্জ্বলের বক্তৃতা চলছে। ও বলছে, “আমাদের গ্রামে যে স্কুলটাতে আমি পড়তাম, সেখানকার একটি ঘটনা দিয়ে শেষ করছি। কয়েক বছর আগের ঘটনা। তখনও আমাদের স্কুলে শহীদমিনার ছিল না। কিন্তু সালাম-বরকত, রফিক-জব্বারদের উত্তরসূরিদের দমিয়ে রাখা যায়নি। তারা করল কী.... ২১শে ফেব্রুয়ারির আগের রাতে এক জায়গা থেকে ছোটো ছোটো তিনটা কলা গাছ কেটে আনল। দারোয়ান মামার সাহায্যে সে রাতেই স্কুলের মাঠে তিনটা গাছের কাটা অংশ পাশাপাশি রেখে একটা শহীদমিনার দাঁড় করাল ওরা। পরদিন সকালে স্কুল-কর্তৃপক্ষ তো সেটা দেখে অবাক। ওখানেই ফুল দিয়ে সেবার ভাষাশহীদদের সম্মান জানায় এই খুদে ভাষাসৈনিকরা। পরের বছরই স্কুল-কমিটির সিদ্ধান্তে সুন্দর একটি শহীদমিনার নির্মাণ করা হয় স্কুলে।”

মুগ্ধ শ্রোতাদের করতালির মধ্য দিয়ে বক্তব্যের উপসংহার টেনে মঞ্চ থেকে নেমে গেল উজ্জ্বল। উপস্থাপকের মাইকে গিয়ে দাঁড়াল ইলমা আর পাভেল। পাভেল বলল, “অনেক অনেক ধন্যবাদ উজ্জ্বল কবিরকে তার চমৎকার স্মৃতিচারণের জন্য।” ইলমা বলল, “প্রিয় দর্শক-শ্রোতা, অপেক্ষার পালা প্রায় শেষ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আগে সর্বশেষ বক্তা হিসেবে এখন মঞ্চে আসবে সন্ধানী সেন।”

দর্শকদের মধ্যে একটা জটলা থেকে যেন একটু বেশিই হাততালি আর উৎসাহমূলক চেঁচামেচি শোনা গেল। ইলমাদের ক্লাসমেটেরা যেদিকটায় বসা, সেখান থেকে।

মাইকের কাছে দাঁড়িয়ে করতালি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সন্ধানী। এরপর অদ্‌ভুতভাবে শুরু করল, "আশা করি কলাগাছের মালিক কিছু মনে করেননি।" দর্শকদের কেউ কেউ হেসে উঠল, বাকিরা ইতস্তত করতে লাগল।

সন্ধানী মুচকি হেসে বলল,

"যা-ই হোক। এতক্ষণ আমাদের শিক্ষক, বন্ধু আর বড়ো ভাইয়া-আপুরা যা যা বললেন, তার পর মনে হয় না আর নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। আর আমি জানি, আপনারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য অনেকক্ষণ ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন... এমনকি আমি নিজেও! (আবার হেসে উঠল দর্শকরা) তাই আপনাদের বেশি সময় নষ্ট করব না। অল্প কিছু বলেই চলে যাচ্ছি। ভাষার মূর্তি নিয়ে তো অনেক কথা হলো। এবার শুধু ভাষা নিয়ে কথা বলি। মানে ভাষা-নামক বিমূর্ত ধারণাটা নিয়ে। পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য মানুষরা যেভাবে ভাষা ব্যবহার করে, এটা কিন্তু খুবই কমপ্লেক্স একটি ব্যবস্থা। আর মানবজাতির এই যে এত উন্নতি, এটার পেছনে মূল অবদান রেখেছে ভাষা। ভাষার মতো জটিল ব্যবস্থাটার কারণেই আমরা খাওয়া, ঘুমানো আর বংশবৃদ্ধি করা ছাড়াও এত এত কিছু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে শিখেছি। সেই চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে মানবসভ্যতাকে এত দূর এগিয়ে আনতে পেরেছি। পশু-পাখিরা কিন্তু সেটা পারে না। তাদের মধ্যে যদি মানুষের মতো *cognitive revolution* ঘটত, তবে একটা সময় গিয়ে তারাও *agricultural, industrial and scientific revolution* ঘটিয়ে ফেলত।

জটিল কেন বললাম? সেটা মনে হয় কোনো একটি ব্যাকরণ বইয়ের সাইজ দেখলেই বুঝতে পারার কথা। (দর্শকদের অনেকে জোরে জোরে মাথা নেড়ে সহমত প্রকাশ করল) আবার গ্রামার বইয়ের রুলস দিয়েও সব হয় না। এই যে আমরা 'পানি'-কে 'পানি'-ই বলি, 'পাপি' কিংবা 'মানি' বলি না, এটাও কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে তৈরি হয়নি। এখানেই শেষ না। আমরা কথার মাঝে ভুল করি, তোতলাই, কথা অর্ধেক বলে থেমে যাই, ভুল উচ্চারণ করি... মজার ব্যাপার কী, জানেন? এত কিছুর পরও একটা বাচ্চা..... এমনকি বধির হয়ে জন্ম-নেওয়া একটা বাচ্চাও এই জটিল সিস্টেমটা একসময় নিজে-নিজেই ধরে ফেলে। কোনো গ্রামার বুকের সাহায্য ছাড়াই। স্বাভাবিক বাচ্চারা তো কথা বলেই। বোবারাও সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করে।"

দর্শকদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন।

সন্ধানী বলে চলল,

"অথচ কিছুক্ষণ ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেমের জটিলতা নিয়ে একটু ভাবুন। মনে হবে অটিজম-আক্রান্ত মানুষগুলোই স্বাভাবিক। কারণ এত জটিল একটা যোগাযোগমাধ্যম এক জীবনে শিখতে পারার কথা না কারোরই। তবু বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ সেটা শিখেই ফেলে। এমনকি একেকজন মানুষ একাধিক ভাষাও পারে। এই যেমন এখানে আমরা সবাই অন্তত বাংলা আর ইংরেজি এই দুটো ভাষা পারি। কীভাবে সম্ভব? কীভাবে শিখলাম? কীভাবে আমরা সকল বস্তুর

নাম দিতে শিখলাম? কেন টেবিল আর চেয়ার আমরা আলাদা নাম দিয়ে চিনি? *Cognitive revolution* কেন ঘটল? আমি জানি না *Evolutionary Biology* এটার কোনো বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেয় কি না। এখানে আমরা প্রায় সবাই যেহেতু কলা অনুষদের, আমরা একটু কল্পনাপ্রবণ হওয়াই স্বাভাবিক। আমি কীভাবে কল্পনা করি, জানেন? ভাষার এই জ্ঞানটা হয়তো মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান কোনো একটি সত্তা একদম প্যাকেজ আকারে আমাদের মগজে ইনস্টল করে দিয়েছে। হতে পারে বিধাতা, গড, ভগবান, আল্লা, ঈশ্বর। হতে পারে কোনো অ্যালিয়েন। এরপর থেকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাষা উদ্ভাবন করে চলেছি। যিনি বা যারাই আমাদের এই ক্ষমতা দিয়ে থাকুন, তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সমগ্র মানবজাতির পক্ষ থেকে আমি তাঁকে বা তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলা, বাঙালি, বাংলাদেশি হিসেবে আমাকে গড়ে তোলার জন্য।”

স্টেজ থেকে নামার পর কোত্থেকে যেন ইলমা এসে খপ করে তাকে জড়িয়ে ধরে রাখল অনেকক্ষণ। করতালির দৈর্ঘ্যও অন্য সবার চেয়ে বেশি হচ্ছে এবার। পাভেল হাসিমুখে বলল, “ওয়েল ডান।”

দর্শক-সারিতে বন্ধুদের কাছে ফিরে আসার পর তারাও অভিনন্দনের বন্যায় ভাসিয়ে দিল। সবার জবাব দেওয়া শেষ করে ধপ করে নিজের চেয়ারটায় বসতেই সন্ধানী টের পেল তার দু-পাশের দুই চেয়ারে রেবা আর চারু বসা।

আমতা-আমতা করে সন্ধানী বলল, “শুধু কলা অনুষদের প্রোগ্রাম জানতাম। সবার এন্ট্রি উন্মুক্ত নাকি?”

চোখ গরম করে রেবা বলল, “কমপ্লেক্স, সিস্টেম, ল্যাঙ্গুয়েজ, গ্রামার, কগনিটিভ, সায়েন্টিফিক, রেভোলিউশন।”

চারু মনে করিয়ে দিল, “ইভোলিউশন, বায়োলজি, ইনস্টল। কমপক্ষে দশটা ইংলিশ ওয়ার্ড ইউজ... আই মিন, ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছিস।”

“শাস্তি হিসেবে আজকে সারারাত রুমে উচ্চাঙ্গ সংগীত বাজবে। শর্মি আর চারু গাইবে।”

সন্ধানী আঁতকে উঠে বলল, “মাফ কর, ভাই। এইটা ছাড়া অন্য কোনো শাস্তি দে।”

“অ্যাই চুপ, চুপ। অনুষ্ঠান শুরু হইতেছে। বাকি কথা রাতে হবে।” বলে তাকে থামিয়ে দিল চারু।

Whatsapp-এ একদিন

ক্লাস টেস্টের পড়ায় একটু মনোযোগ দিতে-না-দিতেই ‘বিপ’ শব্দ করে নোটিফিকেশনের কথা জানান দিল ফোন। সন্ধানী লক খুলে দেখল Whatsapp-এ একটি মেসেজ এসেছে—সেঁজুতির কাছ থেকে। সেঁজুতি ওর সমবয়সী এবং প্রতিবেশী। একই স্কুলে পড়েছে দুজন। কলেজ আলাদা হলেও একই শহরেই ছিল। ভার্সিটি লাইফে সেটাও আর নেই।

"Ki koris?" সেঁজুতির মেসেজ।
"khoi bhaji" রিপ্লাই দিল সন্ধানী।
"asbo?"
"nah. Ami courier kre dteci"
"cloning, genetic engineering-এর এই যুগে ঈশ্বর-এ বিলিভ করার কী দরকার? মানুষ তো নিজেই এখন গড" —আচমকা টপিক পরিবর্তন করে ফেলল সেঁজুতি। সন্ধানী যখন থেকে এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে, তখন থেকে প্রায়ই এটা-ওটা নিয়ে দুজনের কথা হয়। সেঁজুতি অনেকটা ছাত্রীর চরিত্রে অভিনয় করে। এর-ওর কাছ থেকে বিভিন্ন যুক্তি শিখে আসে, তারপর সেটা নিয়ে সন্ধানীকে খোঁচাখুঁচি করে।

"thik. tor moner moto ekta manush banaya oitare bia kor. sukhi ho" নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সন্ধানীর রিপ্লাই।
"na serious"

সন্ধানী বুঝল, আজ আর পড়া হবে না। ভয়েস মেসেজ রেকর্ড করতে শুরু করল,

"শোন। এই প্রশ্নগুলা তৈরি হয় প্রতিপক্ষের ফিলোসফি না বুইঝা তর্ক শুরু করলে। ঈশ্বরের ব্যাপারে ধার্মিকদের কনসেপ্ট না বোঝার কারণে। মানুষ শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টিও করতে পারে না, ধ্বংস করে শূন্যও করতে পারে না। বরং বিজ্ঞানের দাবিই হইল পদার্থ বা শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস নাই, মানে মানুষ পদার্থ শক্তি এগুলা ধ্বংস বা সৃষ্টি করতে পারে না! ধার্মিকদের বিশ্বাস—ঈশ্বর সেইটা পারে। তাই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্লোনিং এগুলা ধার্মিকদের বিরুদ্ধে জুতসই কোনো অস্ত্র না।"

ভয়েস মেসেজ পাঠিয়ে দেওয়ার পর সন্ধানীর মনে হলো আরও কিছু কথা বাকি রয়ে গেছে। আবার রেকর্ড করতে শুরু করল,

"ইনফ্যাক্ট, ক্লোনিংকে যদি কেউ ঈশ্বরের সমকক্ষ হওয়া দাবি করে, তাইলে আগুন আবিষ্কার কইরা প্রথমবার কাঁচা মাংস ফ্রাই করলেও সেই মানুষটা একই দাবি করত। কারণ তখন থেকেই তো বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হইসে বলে ধরা হয়। ঠিক কতটুকু বিজ্ঞান করলে মানুষ গডের সমান হবে, এটার কি কোনো ধরাবাঁধা সীমা আছে?"

মেসেজ যেতে-না-যেতেই আবার 'বিপ'।
"ok tata"

সন্ধানীর শেষ ভয়েস মেসেজটাই ১৭ সেকেন্ডের ছিল। সেঁজুতির তো পুরোটা শুনে পরের মেসেজ টাইপ করতে করতে অন্তত ২০ সেকেন্ড লাগার কথা। এগুলোর কারণেই তার সন্দেহ হয়, সেঁজুতি আসলে জানার জন্য কোনো প্রশ্ন করে না। এমনিই টাইম পাস করার জন্য সন্ধানীকে খোঁচায়।

সন্ধানী মেসেজ পাঠানো বাদ দিয়ে ভয়েস কল করে বসল। প্রায় দেড় মিনিট রিং হওয়ার পরও রিসিভ করল না ওপাশ থেকে। সন্ধানী লাইন কেটে দিয়ে মেসেজ পাঠাল,

"dorkari kotha ache. rcv kor"
জবাব এল, "earphone খুইজা পাইতেসিলাম না। এখন পাইসি, আবার কল মার"

সন্ধানী সাথে সাথে কল দিল। এবারও প্রায় ১০ সেকেন্ড রিং হওয়ার পর রিসিভ করা হলো ওপাশ থেকে। সন্ধানী বলল, "কী? কমার্সের ছাত্রী খুব জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছিস, না?"
"আরে বিজ্ঞানের যুগ। এখন এইগুলা জানা না থাকলে হবে?"
"অ। আচ্ছা পৌরনীতির যুগ কোনটা ছিল?"
"আচ্ছা বল, কী জন্য ফোন দিছিস?"
"ও হ্যাঁ। এই প্রাণ সৃষ্টি করা টাইপের দাবিগুলা এমন, একটা উদাহরণ দেই শোন। একজন ফাঁসির আসামি আর একজন খালাস পাওয়া আসামিকে ডাইকা আনা হলো...."
"ওই টপিক তো শেষ।"
"না, টপিক শেষ না, আরও কথা বা...."
"আচ্ছা।"

দুপাশ থেকে দুজনই থেমে গেল। এই VoIP মাধ্যমে যোগাযোগের একটা বিরক্তিকর দিক হলো—কথা বলার বেশ কিছুক্ষণ পরে অপর পাশ থেকে শুনতে পায়। তার রিপ্লাইটা আবার এইপাশের জন কয়েক সেকেন্ড পর শুনতে পায়।

সেঁজুতি বলল, "আচ্ছা, তুই বল।"
"হ্যাঁ, তো একজন ফাঁসির আসামি আর একজন খালাস পাওয়া আসামিকে ডাইকা আনলাম। ফাঁসির আসামিকে খালাস আর খালাস পাওয়া আসামিকে ফাঁসি দিয়া দিলাম। এরপর বললাম, এই যে দেখেন সবাই, আমিই জীবন দেই, আমিই মৃত্যু দেই।"

সেঁজুতি শব্দ করে হাসতে লাগল। সন্ধানী বলে চলল, "ক্লোন তৈরি.... কথাটা বুঝ, সৃষ্টি না, তৈরি করে মানুষ যখন দাবি করে সে প্রাণ সৃষ্টি করে ফেলসে, তখন এটা এইরকমই লেইম কথা হয়। ওই যে বললাম, আগুন আবিষ্কার কইরা ভাত রান্না করে প্রকৃতিকে জয় করার মতো।"

বেশ কিছুক্ষণ হেসে নিয়ে সেঁজুতি বলল, "প্রক্কিতি না অবশ্য, প্রকৃতি। কিন্তু এই আগুন আবিষ্কার করার যুগে না হইলেও এখন যে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করসে, এটা তো আর অস্বীকার করতে পারবি না।"
"তো বৃষ্টি পড়লে ছাদওয়ালা কোনো জায়গার দিকে মানুষ দৌড় দেয় কেন?"

একটু বিরতি দিয়ে সেঁজুতি বলল, "এভাবে তো ভেবে দেখিনি!"
"হুম, এখন ভাব। আবহাওয়া অফিস, দুর্যোগ ম্যানেজমেন্ট, আশ্রয় কেন্দ্র, ঘরবাড়ি, এসি, ফ্যান, রুম হিটার, রেইনকোট, ছাতা, মাথা—সব আছে। এখনও তো মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারা যায়।"
"প্রাকৃতিক।" সেঁজুতি সংশোধন করে দিল।

"আরে ওই হলো একটা। তো কথা হচ্ছে মানুষের এই ভোগান্তি সব সময়ই থাকবে। নেচারকে মানুষ কখনও ঠিক জয় করতে পারবে না। এগুলা অতিরঞ্জিত দাবি। কিন্তু বিশেষ কোনো সময়ে মানুষ বিশেষ বিশেষ কিছু আবিষ্কার করবে, যাতে সামষ্টিকভাবে মানুষের জীবনযাপন আগের

তুলনায় কিছুটা সহজ হবে। এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে পারে। মানে ঈশ্বর এটাই চাইসে। এই যে মানুষ চাইলেই সূর্যকে পশ্চিম দিকে তুলতে পারতেছে না, এটাই তো ঈশ্বরের সাথে মানুষদের পার্থক্য।”
“তো ঈশ্বর নিজে একবার সূর্যকে পশ্চিম দিকে তুলুক। তাইলেই তো হয়। কেউ আর নাস্তিক থাকল না।”
“হুম। তাইলেই তো হয়।” ভেঙানোর ভঙ্গিতে বলল সন্ধানী, “তুই এমনভাবে বলতেছিস, মনে হয় যেন সূর্য একটা সময় নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিসে। এমনভাবে সে পজিশন নিবে, যাতে পৃথিবী থেকে দেখে মনে হয় সে পূর্ব দিকে ওঠে। এরপরে আসছে ঈশ্বর আর মানুষ। এখন সূর্যকে পশ্চিম দিকে তুলে ঈশ্বরকে নিজের ক্ষমতা প্রমাণ করা লাগবে। কিন্তু ধার্মিকদের কাছে তো বিষয়টা এমন না। তাদের বিশ্বাস, অনাদি ঈশ্বর, উনি সূর্যকে এভাবেই স্থাপন করসে। এখন কারও র‍্যান্ডম চ্যালেঞ্জে তো তিনি এটা চেইঞ্জ করতে বাধ্য না। তুই চ্যালেঞ্জার, তুই পারলে আগে চেইঞ্জ করে দেখাবি।”

বেশ কয়েক সেকেন্ড নীরবতা শুনে সন্ধানী বলল, “হ্যালো?”
ওপাশ থেকে উত্তর এল, “হ্যাঁ, ভাত উতরে পড়ে যাইতেছিল। একটু ঠিকঠাক করে আসলাম। হ্যাঁ, সূর্য নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিল। তারপর?”

সন্ধানীর ইচ্ছে করল আছাড় দিয়ে ফোনটা মাটিতে ফেলে দিতে। রাগে খিজবিজ করতে করতে বলল, “তারপর তোর মাথা।” এই বলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল সে।

একটু পর আবারও ফোনে ‘বিপ’ করল। লক খুলে দেখল সেঁজুতির মেসেজ। “মনীষী আনিস ভাই বলেছেন, ‘আশ্চর্য! মেয়েটা রেগে গেল কেন?’” এবার ফোনের ইন্টারনেট সংযোগই বন্ধ করে দিল সন্ধানী।

সিসিফাসের অ্যাস্কেলেটর

নাটকফাটক দেখতে যে আবিরের খুব ভালো লাগে, তা না। বরং একটু বিরক্তই লাগে। বিজ্ঞানচর্চা করবে, ঔষধ বানাবে, মানবতার উপকার হবে। এ জন্যই তো সে ফার্মাসিতে পড়ে। গান-কবিতা-নাটক দিয়ে কী ঘণ্টাটা উপকার হয় পৃথিবীর? কানিজটা যে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট হয়ে কীভাবে এত নাটকমনা হলো, তাও ঢোকে না আবিরের মাথায়। কিন্তু গার্লফ্রেন্ডের আবদার বলে কথা। কানিজদের হল থেকে তাকে বাইকে তুলে ভার্সিটির অডিটোরিয়ামের দিকে যাচ্ছে এখন।

ওদের কোন বান্ধবীদের ডিপার্টমেন্ট থেকে কী-না-কী মঞ্চনাটকের আয়োজন করা হয়েছে। সেটাই দেখতে যাওয়ার জন্য কানিজের সেইইই রকম চাপাচাপি। কী যেন নাম বলল… ওহ! *সিসিফাসের অ্যাস্কেলেটর*। খুব গভীঈর ফিলোসফিক্যাল নাটক নাকি। কানিজ বলেছে সে ছোটোখাটো একটা লেকচার দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বুঝিয়ে দেবে, যাতে নাটক বুঝতে সমস্যা না

হয়। দিক! আবির তো জানেই এই সবকিছুই তার এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বের হতে থাকবে। মগজে থেকে যাবে কেবল রিনরিনে একটা কণ্ঠস্বর.....

"আরে কই যাও?" স্ন্যাকসের দোকানের দিকে না গিয়ে কানিজকে স্টেজের পেছনে যাওয়ার দরজাটা দিয়ে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করল আবির। "সন্ধানীদের সাথে দেখা করে আসি, চলো।" বলে আবিরের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল কানিজ। সন্ধানীর নাম আগেও কানিজের মুখে শুনেছে আবির, ফেবুতেও দেখেছে। ভুলে গিয়েছিল। কী কঠিন একটা নাম! মানুষের ডাক নাম হবে দুই সিলেবলের। যেমন- আবির, কানিজ, সন্ধ্যা.... ডাক নামে তিন সিলেবল রাখার কী মানে? যেমন কঠিন নাম, তেমন কঠিন লেখা। ফেসবুকে-ব্লগে এদের এক গ্রুপ আছে, কানিজও যার সদস্য। আস্তিক-নাস্তিক বিতর্ক নিয়ে সারাক্ষণ বিশাল বিশাল নোট লেখালেখি আর তর্কাতর্কি চলে।

স্টেজের পেছনে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে। কানিজ ডাক দিল, "অ্যাই সন্ধানী!" ইয়া বড়ো ফ্রেমের চশমা পরা একটা মেয়ে পেছন ফিরে তাকিয়েই একরকম দৌড়ে চলে এল। দুই বান্ধবীতে কোলাকুলি-হাসাহাসি শেষে কানিজ বলল, "সন্ধানী, ও হচ্ছে আবির। যার কথা তোকে বলসিলাম। আর আবির, ও হচ্ছে সন্ধানী।" দু-হাত জোড় করে সন্ধানী বলল, "নমস্কার, দাদা।" আবির হাসি দিয়ে মাথা নাড়ল। কানিজের এত ক্লোজ একজন বান্ধবীর কাছ থেকে আস্তিকসুলভ আচরণ দেখে তার কাছে অন্যরকম ভালো লাগছে।

"আর কিছুক্ষণ পর নাটক শুরু। এখন তো আর গোপনীয়তার কিছু নাই। এখন বল তোর ক্যারেক্টার কী।" কানিজের জিজ্ঞাসা।
"কোনো ক্যারেক্টার নাই। দুই সিনের মাঝখানে পর্দা নামলে স্টেজের সেটিং চেঞ্জ করবে যে টিম, আমি তার মেম্বার। পুরা নাটকেই তো একটা ক্যারেক্টার।"
"কে? সিসিফাস?"
"হুম। রিয়াদ অভিনয় করতেছে।"
"কী? রিয়াদ্যা? এই কুঁইড়ের বাদশা এক ঘণ্টা ধরে একাই অভিনয় করবে? সিরিয়াসলি?"

মিনিট পাঁচেক কথাবার্তা বলার পর স্ন্যাকস আর ড্রিংকস কিনে দর্শক-সারিতে গিয়ে বসল আবির আর কানিজ। আবির এদিক-সেদিক চেয়ে সায়েন্স ফ্যাকাল্টির তেমন কাউকে দেখতে পেল না। কানিজকে বলল, "হ্যাঁ, ম্যাডাম। এইবার জ্ঞান দেন। কী কী না জানলে জানি নাটক বুঝব না?"
"ও হ্যাঁ। মনোযোগ দিয়ে শুনবা কিন্তু। সিসিফাস একটা পৌরাণিক চরিত্র। সে দেবতাদের অভিশাপে চিরকালের জন্য একটা শাস্তিতে বন্দি হয়ে গেসে। একটা পাথরের টুকরা গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ের উপরে তুলে। তারপর সেখান থেকে পাথর আবার গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়। সিসিফাস নেমে এসে আবার সেটা তুলতে শুরু করে।"
"ও আচ্ছা।"
"এই সিসিফাস অনেকটা মানবজাতির সিম্বল। এই যে আমরা অন্ধ প্রকৃতির খেয়ালে বিবর্তিত হয়ে এই অবস্থায় আসলাম, জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নাই, প্রতিদিন একই রুটিন, ঘুম থেকে উঠি, খাই, টয়লেটে যাই, পড়াশোনা করি, শিল্প-সাহিত্য করি, আবার ঘুমাইতে যাই, প্রতিদিনই

কিন্তু more or less একই চক্র চলতেছে। এভাবেই একদিন মরে যাই। সিসিফাস যেভাবে অর্থহীন একটা কাজ বারবার করতেছে, আমাদের জীবনটাও তা-ই।"

কানিজকে একটু বিরতি নিতে দেখে আবির বলল, "এই নাটকে কি সিসিফাস অ্যাস্কেলেটর দিয়া পাহাড়ে উঠবে?"
"হতে পারে।"
"শেষ? এইই নাটক?"
"আরে এখানেই তো তুমি আগ্রহ পাবা, দেইখো। অ্যাস্কেলেটরের আবিষ্কার মানে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি। আমার মনে হয় এইখানে দেখানো হবে বিজ্ঞান কীভাবে আমাদের মিনিংলেস জীবনকে মিনিংফুল করসে। ধর্মান্ধরা চাইসিল ধর্মের মাধ্যমে জীবনকে অর্থপূর্ণ করতে। কিন্তু তারা ব্যর্থ। সেই কাজটা করে দিসে বিজ্ঞান।"

বিজ্ঞানের কথা শুনে আবিরের আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। হঠাৎ মনে হলো, "নাহ! নাটক-সিনেমার আসলে দরকার আছে।" ওদিকে পরিচয়-পর্ব শেষ। তাই স্টেজ থেকে নাটক শুরুর ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আবিরের চোখে আগ্রহের ঝিলিক দেখে কানিজ বলল, "ইন্টারেস্টিং হবে নাটকটা, শিওর। বাট রিমেম্বার, এটা কিন্তু *Absurdist* থিয়েটারের নাটক। ক্যারেক্টার সংখ্যা খুউবই অল্প, সন্ধানী বলল না—একজন মাত্র? তা ছাড়া খুউবই কম ডায়লগ, একটা ডায়লগও না থাকতে পারে। খুউব কম কাহিনি, স্টেজের উপরে জিনিসপত্রও কম। তাই বোরিং লাগতে পারে। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোর হবা না।"

পর্দা উঠে গেছে। স্টেজের চারপাশে ছড়ানো ছিটানো পাথর আর পেছন দিকে গুহার ছবিওয়ালা প্রপস কেমন একটা আদিম ভাব এনে দিয়েছে। স্টেজের মাঝখানে পিরামিডের মতো একটা উঁচু কাঠামো রাখা। তবে চূড়াটা পিরামিডের মতো চোখা নয়। একজন মানুষ দাঁড়াতে পারার মতো চওড়া। পিরামিডের ডান দিকে একটা গোলাকার জিনিস পাশে-নিয়ে-দাঁড়ানো আদিম মানুষদের পোশাক পরা এক যুবক। কানিজ আবিরকে বলল, "এইটা সিসিফাস।"

প্রায় এক-দেড় মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে রইল যুবকটি। তারপর পিরামিড কাঠামোর ডান দিকের প্রায় মসৃণ পৃষ্ঠটি দিয়ে গোলাকার জিনিসটি গড়িয়ে তুলতে লাগল। এভাবে দশ ফিট উঁচু কাঠামোটার চূড়ায় নিয়ে গেল গোল্লাটাকে। রাখতে-না-রাখতেই গড়গড়িয়ে আবার পড়ে গেল সেটি। সিসিফাস পিরামিডের ঢাল বেয়ে নেমে এল। তারপর গোলকটা আবার তুলতে শুরু করল উপরে।

একবার.... দুইবার.... তিনবার... গুনতে গুনতে একসময় হিসাব গুলিয়ে ফেলল আবির। কানিজের আগাম সতর্কবাণী মাথায় রাখার পরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যাচ্ছে। কানিজ হঠাৎ বলল, "এই, খেয়াল করসো? মুভমেন্টের স্পিড কমে গেছে।" বলার পর খেয়াল করল আবির। আগের চেয়ে কিছুটা ধীরে ধীরে উঠছে সিসিফাস। আবিরের বিরক্তি বাড়ল। কাহিনি তা হলে আগানোর বদলে পিছিয়ে যাচ্ছে।

একই জিনিস পুনরাবৃত্তি হতে লাগল অনেকক্ষণ। পিরামিডের চূড়ায় গোলক তুলে নেওয়া, পড়ে যাওয়া, নেমে আসা, আবার তোলা... আবারও ঘুম চলে আসছিল আবিরের। এরই মধ্যে রীতিমতো বুড়োদের মতো কুঁজো হয়ে শম্বুকগতি ধারণ করল সিসিফাস। তারপর বলা নেই কওয়া নেই, পিরামিডে আরোহণের মাঝপথে থাকতেই হুড়মুড় করে ডিগবাজি দিয়ে নিচে পড়ে গেল সে। নিথর পড়ে রইল অনেকক্ষণ। পর্দা নামতে শুরু করল। কানিজ বলল, "মরে গেসে। বয়স বাড়ার কারণে স্লো হয়ে গেছিল, বুঝছি।" আবির ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভাবতে লাগল নাটক শেষ কি না।

মিনিট দুই পরে পর্দা উঠল। একই আছে পিরামিড আর গোলক। শুধু সিসিফাসের পোশাকটা একটু অন্যরকম। পেছনের প্রপসে ফসলের মাঠের ছবি। আশপাশে পাথরের বদলে ছড়ানো কিছু ঘাস। কানিজ বলল, "বুঝসো, কী হইসে? কৃষিবিপ্লব।"
"ও আচ্ছা। কিন্তু সিসিফাস না মরে গেসিল?" আবিরের জিজ্ঞাসা।
কানিজ জবাব দিল, "তাতে কী? সে তো একক কোনো মানুষ না, পুরা মানবজাতির সিম্বল।"
"ও আচ্ছা।" আবিরের নির্লিপ্ত জবাব।

পিরামিডের চূড়ায় গোলক তুলে নেওয়া, পড়ে যাওয়া, নেমে আসা, আবার তোলা। তবে আগের চেয়ে গতি একটু বেশি। তারপর আবারও আগের মতোই একটু একটু করে সিসিফাসের বুড়িয়ে যাওয়া.... আবির ঘড়ি দেখল। দ্বিতীয়বার পর্দা ওঠার পর থেকে মিনিট পনেরো চলে গেছে। নাটক চলছে আধা ঘণ্টার বেশি ধরে। আবিরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার আগমুহূর্তে আবারও হুড়মুড়, আবারও নিথর সিসিফাস। আবারও পর্দা নামল।

"এবার কি বিজ্ঞানের যুগ আসবে?" আবিরের জিজ্ঞাসা।
কানিজ বলল, "মনে হয়।"

পর্দা ওঠার পর স্টেজের পেছনে ফসলের মাঠের বদলে কলকারখানার ছবি দেখা গেল। ভাঁক ভাঁক করে ধোঁয়া উড়ছে কারখানা থেকে। সিসিফাস এবার পুরোদস্তুর শার্ট-প্যান্ট পরা ফুলবাবু। পিরামিডে আরোহণের রাস্তা এখন সিঁড়ির মতো ধাপে গড়া। গোলকটা কোলে নিয়ে সিঁড়ির কয়েক ধাপ উপরে রাখছে সিসিফাস, তারপর নিজে উঠছে। এবার গোলক আর গড়িয়ে না পড়ে সিঁড়ি বেয়ে ধুপধাপ করে পড়তে লাগল। আগের দুই পর্বের সমান সময় ধরে চলল এই পর্ব। কিন্তু সিসিফাস ওঠানামা করেছে আগের চেয়ে বেশি। আরেকটি পার্থক্য হলো একটু পরপর সে খুকখুক করে কাশছে।

"হুমম... কলকারখানার ধোঁয়ার প্রভাব!" নাট্য-বিশারদের ভঙ্গিতে বলল আবির।
কানিজ বলল, "বাহ! এই তো বুঝতে শুরু করেছেন, জনাব।"

যথাসময়ে মারা গেল সিসিফাস। তৃতীয়বারের মতো পর্দা নামল। এবার পর্দা ওঠার পর কলকারখানার ছবির জায়গায় আরও হাইরাইজ সব বিল্ডিং। কানিজ বলল, "এইটা ফাইনালি বিজ্ঞানের যুগ। আগেরটা মে বি শিল্পবিপ্লব ছিল।"

পিরামিডের সিঁড়ি এখন কোমর সমান উঁচু রেলিঙের মতো কিছু একটা দিয়ে দর্শকদের থেকে আড়াল করা। সায়েন্স ফিকশন মুভির চরিত্রদের মতো ড্রেস পরা সিসিফাস হঠাৎ এই পর্বে

কেমন যেন ভোটকা হয়ে গেছে। এবার ঘটল মজার ঘটনা। গোলকসহ সিসিফাস রেলিংটার পেছনে চলে যায়। তারপর জাদুর মতো উপরে উঠতে থাকে। রেলিঙের পেছনে কিছু একটা কারিকুরি করা হয়েছে, যার উপর দাঁড়ালে চলন্ত সিঁড়ির মতো পিরামিডের চূড়ায় উঠে যাচ্ছে সিসিফাস। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ সিসিফাসকে দিয়েছে অ্যাস্কেলেটর। সিসিফাসের অ্যাস্কেলেটর!

আগের মতোই গোলকটা চূড়া থেকে পড়ে যাচ্ছে। সিসিফাস উঠছে-নামছে অ্যাস্কেলেটর দিয়ে। তবে এখানে প্ল্যানিংয়ে একটু ফাঁক রয়ে গেছে। গোলকটা যে সিসিফাসের অভিনেতা নিজেই আলতো করে ঠেলা দিয়ে ফেলে দেয়, এটা এই পর্বে মনোযোগী দর্শকের চোখে ধরা পড়ে যাবে। যাক, তবু ক্ষমা করা যায় মঞ্চনাটক বলে। টিভি নাটক হলে নাহয় অন্য ব্যবস্থা করা যেত।

এভাবেই চলতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ পকেট থেকে একটা কৌটা বের করে ট্যাবলেটের মতো কী যেন খায় সিসিফাস। মাঝে মাঝে স্মার্টফোন বের করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে স্ক্রিনের দিকে। আগের পর্বগুলোর প্রায় সমান সময় চলে গেছে। সিসিফাসের গতি একটুও কমছে না। দর্শকদের মধ্যে একটু একটু উত্তেজনা। এটাই শেষ দৃশ্য হবার কথা। চমকে দেওয়ার মতো কোনো কিছু এবারই ঘটবে। কানিজ হঠাৎ শিরদাঁড়া সোজা করে বসে বলল, “আরে অসাম! সিসিফাস বুড়ো হচ্ছে না। বিজ্ঞান! আবির, বিজ্ঞান! সিসিফাস অমর, আবির! মানুষ অমর! Finally, it's the end of our *existential dread*!”

দর্শকদের মধ্য থেকে কিছু ছেলেমেয়ে বলতে লাগল, “সিসিফাস, মরিস না!” “বেঁচে থাকো, সিসিফাস!” “Live! Live! Live! Live...” যেন খেলার মাঠে প্রিয় দলকে উৎসাহ দিচ্ছে। সিসিফাসের বাঁচা-মরার উপর যেন নির্ভর করছে গোটা মানবজাতির অস্তিত্ব।

এদিকে প্রতি রাউন্ড ওঠানামায় আগের চেয়ে বাড়ছে সিসিফাসের গতি। উত্তেজনায় ঠোঁট চাটল আবির। কানিজের কম্পমান বাম হাতটা খামচে ধরে আছে আবিরের ডান কবজি। এখন রীতিমতো ঝড়ের বেগে কাজ করছে সিসিফাস। মাঝে মাঝে ট্যাবলেট খাচ্ছে, ফোন বের করে তাকিয়ে থাকছে। তোলা... পড়ে যাওয়া... নেমে আসা... আবারও তোলা। তোলা, পড়ে যাওয়া, নেমে আসা, আবারও তোলা। তোলা-পড়ে-যাওয়া-নেমে-আসা আবারও-তোলা...

হঠাৎ একটা আর্তচিৎকার! পুরো নাটকে এই প্রথম আওয়াজ করল সিসিফাস। পা হড়কে যাওয়ার ভঙ্গিতে মারাত্মকভাবে অ্যাস্কেলেটর থেকে নিচে পড়ে গেল। বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল ট্যাবলেট, ট্যাবলেটের কৌটা, স্মার্টফোন আর অনাদিকালের পুরাতন সেই গোলক।

হতাশা প্রকাশ করার মতো আওয়াজ এল দর্শক সারির কিছু কিছু জায়গা থেকে। কানিজের চোখ বিস্ফোরিত। যেন এক সেক্যুলার যিশুর অপেক্ষায় থাকা ভক্তকুলকে হঠাৎ জানানো হলো—কেউ আসবে না তাদের উদ্ধার করতে।

পর্দা নেমে গেল। নেমেই থাকল। আর উঠল না। মাইকে নাটকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। মিনিটখানেক পর চারদিক থেকে শুরু হলো করতালি।

আবির আচমকা বলে উঠল, “আরে ঠিকই তো! বিজ্ঞান আমাদেরকে গতি দিসে ঠিকই। কিন্তু জীবনকে মিনিংফুল তো করে নাই। আমরা আগের মতোই খাই, ঘুমাই, টয়লেট করি, একটা

সময়ে মারা যাই। বিজ্ঞানের কারণে মানুষ অমর হয়ে গেলেও অ্যাক্সিডেন্ট, খুন, আত্মহত্যা, যুদ্ধ তো আর থাইমা থাকবে না। শেষমেশ মরতেই হচ্ছে। ওই একই মিনিংলেস এক্সিস্টেন্স। ঠিক ধরসি না?” উৎসাহ নিয়ে কানিজের দিকে চাইল আবির।

কানিজ তখনও আগের মতোই বিস্ফোরিত চোখে চেয়ে আছে মঞ্চের পর্দার দিকে। আবিরের প্রশ্ন শুনে মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, “চুপ করো! খুউব নাটক-বিশারদ হইছে! যত্তসব।”

আবির ভ্যাবাচেকা খেয়ে কানিজের পেছন পেছন উঠে এল। অডিটোরিয়াম থেকে বের হয়ে আসার আগে ফিল্টার থেকে ঢকঢক করে পানি পান করল কানিজ। দুজনে বাইকের কাছে এসে দাঁড়ানোর পর একটা কণ্ঠ ডাক দিল, “কানিজ, ওয়েট।”

আবির ঘুরে তাকাল। সন্ধানী নামের মেয়েটা। কাছে এসে আগে আবিরের দিকে ঘুরে বলল, “দাদা, কেমন লাগল নাটকটা?”
আবির মৃদু হেসে জবাব দিল, “হ্যাঁ, ভালোই। প্রথমে কিছু বুঝি নাই। পরে আস্তে আস্তে ধরতে পারসি। নাইস কনসেপ্ট। অনেক ডিপ। ওয়েল ডান।”
“থ্যাংক ইউ, দাদা। কানিজ, তোর কেমন লাগল?”

কানিজ কিছু না বলে আবিরের পেছনে বসে পড়ল। তারপর ভারতীয় সিরিয়ালের কুটনি মহিলাদের মতো পেছন ফিরে বলল, “সন্ধানী, হইতে পারে বিজ্ঞান আমাদের লাইফকে মিনিংফুল করে না। তাই বলে সেই ফাঁকা জায়গায় গড আর ধর্মকে বসায়ে দিয়ে ফাঁক পূরণ করার কোনো যুক্তি নাই, বুঝলি?”

সন্ধানী কেবল শ্রাগ করল। কানিজ অনেকটা ধমকের সুরে আবিরকে বলল, “অ্যাই স্টার্ট দাও না ক্যান? খিদা লাগসে তো! তাড়াতাড়ি যাইতে হবে।”

এতক্ষণ পেছন ফিরে নতুন এই নাটকের দিকে তাকিয়ে থাকা আবির এবার সামনে ফিরে বাইক স্টার্ট দিল।

লোকায়ত আচার-পার্বণ

হলের ছাদে ধ্যান করতে বসলে প্রায়ই এখন এই ঝামেলাটা হয়। ফার্স্ট ইয়ারের মেয়ে একটা মোবাইল কানে নিয়ে এই সাত সকালেই ছাদে উঠে “জানুউউ! জানুউউ!” শুরু করে। আরে বাবা হয় পড়তে বস, নয়তো এক্সারসাইজ কর, নয়তো ধর্মীয় কোনো আচার অনুষ্ঠান থাকলে সেটা কর। বয়ফ্রেন্ডের সাথে এত প্যানপ্যান করার কী আছে! মনে হচ্ছে লোকালয় থেকে দূরে কোনো পাহাড়ি গুহায় ধ্যান করতে পারলে ভালো হতো।

ছাদ থেকে নেমে রুমে চলে এল সন্ধানী। রুমমেটরা এখনও ঘুমে। ফোনের কন্টাক্ট লিস্ট বের করে বাবার নম্বরটা বের করল। সাথে সাথেই বিরক্তির ভাবটা চলে গেল তার চেহারা থেকে। আজ একটি বিশেষ দিন।

"শুভ বিজয় দিবস, মা!"
"শুভ বিজয় দিবস, বাবা। কী করছ?" জিজ্ঞেস করল সন্ধানী।
"জগিং সেরে এলাম," জবাব দিলেন সুব্রত সেন, "তোর মায়ের সাথে বসে নাস্তা করছি। একটু পর বের হব স্টেডিয়ামে প্যারেড দেখতে যেতে। সাধন তো ওর স্কুলের টিম লিডার। বলেছিল না তোকে?"
"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছে।"
"বিটিভিরটা আজকে আর দেখা হবে না আরকি।"

নীরবে হাসল সন্ধানী। কোনো জাতীয় দিবসে প্যারেড দেখা মিস করেন না তার বাবা। এ বছর নিজের ছেলে স্কাউট দলের নেতৃত্ব দিয়ে প্যারেড করবে, এটা তো তার জন্য সোনায় সোহাগা। প্রায়ই বলেন, "আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কোনটা, জানো?"

সাধন, সন্ধানী আর তাদের মা—তিনজনই তা জানে। কিন্তু জবাবটা তার মুখ থেকেই শুনতে চায়।

তিনি বলে চলেন, "যুদ্ধের দিনগুলোতে সহযোদ্ধাদের সাথে বন-বাদাড় পার হওয়া, ভিজে যাওয়ার ভয়ে মাথার উপর রাইফেল তুলে ধরে বুক সমান পানি পার হওয়া, মুখোমুখি সংঘর্ষে রাইফেলের ঠা ঠা ঠা ঠা শব্দ, আর সে কী বারুদের গন্ধ! হঠাৎ ধপ করে পড়ে যাওয়া কোনো কমরেডের লাশ! কখনও টিকতে না পেরে পিছু হটা, আর কখনও শত্রুদের পালাতে দেখা, জয় বাংলা বলে আবার আগে বাড়া..." বলতে বলতে গলা ধরে আসে সুব্রত বাবুর, চোখ ভিজে যায়।

ফোন কানে নিয়েই কথাগুলো ভাবতে থাকে সন্ধানী। "ভার্সিটিতে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে কিন্তু অবশ্যই যাবি, মা। বুঝলি?" বলেন সুব্রত বাবু।
"যাব, বাবা। অবশ্যই যাব।"

"কী রে? এত লাল-সবুজের ভিড়ে তুই অমন মাল্টিকালারের কেন?" বিশ্ববিদ্যালয় শহীদমিনার চত্বরে সাংস্কৃতিক সংগঠন "সুরেলা"র আয়োজিত কালচারাল প্রোগ্রামে সন্ধানীকে দেখেই জিজ্ঞেস করল নাবিলা।
"মাল্টিকালারের মধ্যে লাল-সবুজও তো আছে।" সন্ধানীর জবাব।
"ব্রিলিয়ান্ট!"

দুপুরের আজানের জন্য অনুষ্ঠানে আপাতত বিরতি চলছে। এর মধ্যেই দেখা দুইজনের। ছায়াওয়ালা জায়গা দেখে ঘাসের উপর বসে আড্ডা জুড়ে দিল দুজন।
"আসল কাহিনি হলো," বলল সন্ধানী "ফার্স্ট ইয়ারের মেয়ে একটা, তানিয়া নাম, ওর 'জানু'র সাথে ঘুরতে যাবে। কিন্তু লাল-সবুজ ম্যাচিং করা জামার সেট নাই। সারা হলে তুলকালাম কইরা ফেলসে সবার কাছে খুঁজতে খুঁজতে।"
"তারপর তোর কাছে এসে পাইসে?" নাবিলার জিজ্ঞাসা।
"আমিই ডাকায়া আনলাম আমার রুমে। নাম পরিচয় জানলাম। তারপর জামাটা ধরায়া দিলাম।"

"আর নিজে পরলি এইটা? কোনো কথা হইল?"
"রিল্যাক্স, ইয়ার। ছোটো বোনটার মন ভালো হইছে, সেটাই বড়ো কথা। আমার দেশপ্রেম তো জামার রঙে না, আমার মনে।"
"হুমম।"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর নাবিলা বলল, "কানিজ তো প্রায়ই তোর ধার্মিক-হয়ে-যাওয়া নিয়া আফসোস করে।"
মৃদু হাসল সন্ধানী। কিছু বলল না।
"তো এইটা সম্পর্কে তোর মন্তব্য কী?" তর্জনী দিয়ে শূন্যের দিকে কোথায় যে দেখাল নাবিলা, তা বোঝা গেল না।
"কোনটার ব্যাপারে?" এদিক-ওদিক তাকিয়ে সন্ধানীর প্রশ্ন।
"এই যে আজান শুরু, গানবাজনা বন্ধ করতে হইল। পৌনে একটা থেকে শুরু হইসে, সোয়া একটা-দেড়টা পর্যন্ত একেক জায়গায় আজান চলতেই থাকবে। লাঞ্চ ব্রেকের আগে আর কিছু করাই যাবে না।"
"হুম। তো?"
"আচ্ছা একটু ভেঙে বলি। সব ধর্মেরই তো মোটা দাগে দুইটা দিক আছে। একটা হইল বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, *rituals*। পূজা করা, নামাজ পড়া, প্রে করা, তীর্থযাত্রা, হজ এটসেট্রা।"
"হুম। আরেকটা?"
"আরেকটা হলো জাগতিকতার সাথে রিলেটেড জিনিসগুলো। গরিবদেরকে সাহায্য করা, ভালো আচরণ করা, দুর্নীতি না করা। মানে যেগুলার বাস্তব আউটপুট আমরা দেখি। তো এই কাজগুলা তো নাস্তিকরাও করে। ধার্মিকদের সাথে আমাদের পার্থক্যটা কিন্তু মূলত রিচুয়ালসের দিকটা নিয়ে। এসব আনুষ্ঠানিকতাগুলা কি ধর্মের চাপায়ে-দেওয়া এক্সট্রা কিছু বোঝা না? গরিবদেরকেও সাহায্য করলি, দুর্নীতিও করলি না। কিন্তু ইন্ডিয়ায় বা সৌদিতে গিয়া ঠিকই দেশের টাকাগুলা গঙ্গা আর জমজমের পানিতে ফালায়া দিয়া আসলি। লাভটা কী হইল?"

সন্ধানী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় রিয়াদ এসে হাজির। "দ্যাখ তো, কোন সানগ্লাসটা আমাকে মানায়? এইটা, নাকি....?" বলতে বলতে চোখের সানগ্লাসটা খুলে পাঞ্জাবির গলায় লাগানো সানগ্লাসটা চোখে লাগাচ্ছিল রিয়াদ।
তার আগেই মেকি বিস্ময়ের সুরে নাবিলা বলল, "রিয়াদ, এমন একটা বন্ধের দিনে তুই জাইগা আছিস?"
"তুই-না বললি পৃথিবীর মোট ঘুমের পরিমাণ কন্সট্যান্ট?" সন্ধানী যোগ করল, "তোর ঘুম অন্যেরা ঘুমিয়ে ফেলতেছে কিন্তু।"
রিয়াদের মুখটা ব্যাজার হয়ে গেল। "ধুর, তোরা আসলে আমার ফ্রেন্ড না।" বলে পেছন ফিরে হাঁটা দিল সে। হাস্যরত সন্ধানী আর নাবিলা জানে একটু পর ঠিকই ফিরে আসবে সে। ঠিক তা-ই হলো। চার-পাঁচ পা গিয়েই আবার ফিরে এসে রিয়াদ বলল, "দোস্ত, আসলে ঘুম হইতেছিল না। হলের ভিতরের মাঠে সাউন্ডবক্সে সকাল থেকে ৭ই মার্চের ভাষণ প্লে করে রাখসে। আর সাউন্ডবক্সটা একবারে আমার রুমের দিকে মুখ করা।"

হাসির চোটে মুখ থেকে আওয়াজ বের হচ্ছে না নাবিলা আর সন্ধানীর। হঠাৎ থেমে গিয়ে কেমন সতর্ক হয়ে গেল নাবিলা। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সন্ধানী দেখল একটু সামনেই রাস্তা ধরে কোনো একজন শিক্ষক হনহন করে হেঁটে যাচ্ছেন। নাবিলা নিচু স্বরে বলল, "জুলজি'র মোস্তাহাব স্যার। গত বছর আমাদের একটা কোর্স পড়াইসিল উনি।"

প্রায় দৌড়ে গিয়ে নাবিলা বলল, "গুড আফটারনুন, স্যার।"
স্যার অনেকটা চমকে গিয়ে তাকালেন। তারপর হেসে বললেন, "গুড আফটারনুন। ভালো আছ?"
"জি, স্যার। আপনি এই সময়ে এত ব্যস্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছেন, স্যার?"
স্যারের হাসিটা নিভে গেল। এদিক-ওদিক চেয়ে খুব নিচু গলায় বললেন, "মা রে, ২০ তারিখ পর্যন্ত ছুটি নিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলাম বাবার চিকিৎসার জন্য। ১৪ তারিখেই না গিয়ে উপায় ছিল না। আমি ছাড়া কাজটাজ করার মতো কেউ নেই। কিন্তু ডিপার্টমেন্টের ১৬ই ডিসেম্বরের প্রোগ্রামে হাজিরা প্লাস বক্তৃতা দেওয়া সব টিচারদের জন্য বাধ্যতামূলক। অনেক বুঝিয়েও লাভ হয়নি। তাই হন্তদন্ত হয়ে এলাম, একটু পরই আবার চলে যাব।"
"ওহ সরি, স্যার। আপনার সময় নষ্ট করলাম।"
"নাহ, ঠিক আছে। আচ্ছা এখন আসি। ভালো থেকো তোমরা।"

সন্ধ্যাবেলা। কিছু অনুষ্ঠান শেষ, কিছু চলছে, আর কিছু শুরু হচ্ছে কেবল। কিন্তু সন্ধানীরা ক্লান্ত। তাদের এবার হলে ফেরার পালা। ইচ্ছে করেই নাবিলার সাথে একই রিকশা নিল। ওই টপিকের আলোচনাটা শেষ করতে চায় জেনে নাবিলাও সানন্দে রাজি হলো। রিকশাওয়ালা মামাকে বলে রেখেছে—যতক্ষণ তাদের গল্প শেষ না হবে, ততক্ষণ সারা ক্যাম্পাস খালি চক্কর দিতে হবে। গল্প শেষে দুজনকে দুজনের হলে নামিয়ে দেবে। "আইচ্ছা, খালামণিরা।" জবাব দিল রিকশা মামা।

"সব ধর্মের সব আচার-অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা বা সামর্থ্য কোনোটাই আমার নাই," শুরু করল সন্ধানী। "কিন্তু আমি মনে করি রিচুয়ালস কেবল ধর্মের বৈশিষ্ট্য না। আমাদের সেক্যুলার লাইফেও বিভিন্ন রিচুয়ালস আছে। From a strict materialist point of view, these are totally meaningless."
"ইন্টারেস্টিং। তারপর?" নাবিলা বলল।
"আচ্ছা একটা মানুষ দেশপ্রেমিক কি না, কীভাবে বুঝব বল তো!"
"অনেক স্কেলই আছে। দেশের আইনের প্রতি অনুগত থাকবে, দুর্নীতি করে দেশের ক্ষতি করবে না, সরকারি সম্পদ অপচয় করবে না... কয়টা বলব? ওয়েল, বাংলাদেশি হইলে প্রশ্নকর্তার দলের সমর্থক হইতে হবে।"
"হুম। ধর একজন মানুষ এই সবগুলা কাজই করে। কিন্তু 'আমার সোনার বাংলা' শুরু হইলে উইঠা দাঁড়ায় না। অথবা ধর এটাকে জাতীয় সংগীত বলেই মানে না, সো কল্ড 'হিন্দু' রবীন্দ্রনাথের লেখা গান বলে। তাকে কি দেশপ্রেমিক বলা যাবে?"
"তা হলে বলতে চাইতেছিস জাতীয় সংগীত একটা সেক্যুলার রিচুয়াল?"
"কাইন্ড অব।"

“মিলে না। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলা মানুষের উপর এনফোর্স হয়। সেগুলাকে ডিভাইন মর্যাদা দেয়া হয়। তুই জানিস, মুসলমান শাসকরা একসময় বেনামাজিদেরকে জেলে আটকে রাখত? তওবা না করলে মৃত্যুদণ্ড দিত? ধর্ম এমন একটা কড়া রুটিন মেনটেইন করে অনুসারীদেরকে দিয়ে এসব করায় যে, তারা এটাতে *zombie*-র মতো অভ্যস্ত হয়ে যায়। তুই জানিস বছরে চৌদ্দোটা পূজায় কত লক্ষ-কোটি টাকা পানিতে ভাসানো হয়? দিনে পাঁচবার যদি এতগুলা মানুষ মসজিদেই দৌড়াদৌড়ি করে, তা হলে কত হাজার হাজার ওয়ার্কিং আওয়ার নষ্ট হয়?”

“এনফোর্সমেন্ট আর ডিভিনিটির বিষয়টা তুই সেক্যুলার লাইফেও পাবি। জাতীয় সংগীত ফোনে রিংটোন হিসেবে সেট করা বৈধ কি না, এইটা নিয়ে একবার তুলকালাম হয়ে গেসিল। টয়লেট বা এমন কোনো জায়গায় ফোন বাজলে নাকি জাতীয় সংগীতের পবিত্রতা নষ্ট হবে। শহীদমিনারেও তো আমরা জুতা খুইলা উঠি। স্কুলে থাকতে তো প্রতিদিন এসেম্বলির সময় জাতীয় সংগীত গাইতাম না? আনিসুল হকের *Mad in Bangladesh* মুভিটার কথা মনে আছে? জাহিদ হাসান যে খেলনা পিস্তলের ভয় দেখায়া বিভিন্ন পেশার মানুষকে দিয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়াইল? এগুলাও তো নাগরিকদেরকে একটা রুটিন মানতে অভ্যস্ত করার সিস্টেম। এই কাজে কি ওয়ার্কিং আওয়ার নষ্ট হয় না? তুই কট্টর বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বল তো, এগুলোর বাস্তব কোনো আউটপুট আছে কি না? এগুলো না মেনেই কেউ দেশপ্রেমিক হতে পারে কি না?”

“উঁহু, তাও মিলতেছে না। সেক্যুলার রিচুয়ালগুলা সবাই মেনে নেয়। এসব নিয়া ঠোকাঠুকি হয় না। কিন্তু নামাজের সময় পূজার ঢোল বাজান হইসে, এই অভিযোগে কত দাঙ্গা হয়ে গেল উপমহাদেশে! সব সময় এটা নিয়া একটা থমথমে পরিবেশ থাকে। দোষটা কার? অবশ্যই ধর্মীয় রিচুয়ালগুলার।”

“তাই? তা হলে মুক্তিযুদ্ধের ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের বিপরীতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা আরেকটা ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’ স্লোগান আবিষ্কার করল কেন? দুই দশক ধরে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এই দেশে নিষিদ্ধ ছিল! ভাবতে পারিস? সেটার প্রতিক্রিয়ায় এখন এমন এমন জায়গায় ভাষণের রেকর্ড বাজায়া রাখা হয় যে, মানুষ বিরক্ত হয়ে যায়, কিছু বলতে পারে না। স্লোগান আর ভাষণ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে এত টানাটানি কেন?”

“কিন্তু তুই বিগার পিকচারটা মিস করতেছিস। আমরা বাঙালি। জাতীয় সংগীত, শহীদমিনার, জয় বাংলা স্লোগান, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ—এগুলা আমাদের জাতীয় আইডেন্টিটির অংশ। হয়তো পদ্ধতিটা ঠিক হইতেছে না। মানুষকে জোর করা হচ্ছে। কিন্তু এগুলার প্রতিই যার ভালোবাসা নাই, চর্চা নাই, সে ওই অর্থে দেশপ্রেমিক হয়ে গড়ে ওঠে না।”

“সেটাই তো আমিও বলতে চাইতেছি। রিচুয়ালসের দরকার আছে। এই একই কাজ ধর্মগুলোও করতেছে। তারা তাদের অনুসারীদের আইডেন্টিটি তৈরি করে। আমার মা প্রত্যেকদিন পূজা করে, এই রুটিনে নিজেকে মানিয়ে নেন, যাতে অসুরের সামনে উনি দুর্গার মতো রুখে দাঁড়াতে পারে। প্যারেড মাঠে সবাই একতালে লেফট-রাইট করে, যেন হানাদারদের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে একটা স্পিরিচুয়াল ইউনিটি গড়ে ওঠে। এগুলা সবই রিচুয়ালস, আচার-অনুষ্ঠান। বস্তুবাদীদের চোখে এসবের কোনো মূল্য নাই, কিন্তু বিগার পিকচারে খুবই এসেনশিয়াল। আমি

কোনো পক্ষের আচার-অনুষ্ঠানকে খাটো করছি না। শুধু দেখাতে চাইতেছি যে, আচার-অনুষ্ঠানকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।”

“না, না। তুই বুঝতে পারতেছিস না। সামাজিক জীবনে মানুষের এমন কিছু বিষয় দরকার, যেগুলোকে ধরে একটা জাতি থিতু হবে। কিন্তু ধার্মিকরা পার্সোনাল লাইফেও অনেক অর্থহীন জিনিস মানে। তসলিমা নাসরিনের একটা অভিজ্ঞতা এরকম ছিল। উনি একজায়গায় ইন্টার্ভিউ দিতে গেলেন। তার আগেরজন ইন্টার্ভিউ দিতে ঢুকে সালাম দিল, ইন্টার্ভিউ বোর্ডের সবাই খুব খুশি। কিন্তু সেই লোকই ইন্টার্ভিউ শেষে বের হয়ে এসে উনাদেরকে গালাগালি করতে লাগল। অন্যদিকে তসলিমা নাসরিন বলসিলেন শুভ সকাল। ইন্টার্ভিউ বোর্ডের উনারা মনে হয় জানি রাগ কইরা বসলেন। এসব ভণ্ডামোর কী দরকার, যদি সামনে সালাম দিয়া পেছনে গালাগালিই করতে হয়?”

“ওই যে বললাম, বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অনেককিছুই অর্থহীন। শুভ সকাল বা গুড আফটারনুন এসব বলার অর্থ কী? তুই প্রার্থনা করতেছিস যাতে তার সকাল বা বিকালটা ভালো কাটে। কার কাছে প্রার্থনা করতেছিস?”
“কারও কাছে না। আমি জাস্ট জানাইতেছি যে, আমি তার শুভাকাঙ্ক্ষী।”
“সেটাই তো। শুভটা কার কাছে আকাঙ্ক্ষা করিস? কাউকে মুখে না বললে কি সে ধইরাই নিবে আমি তার অশুভাকাঙ্ক্ষী? কাউকে ‘ভালো থেকো’ না বললে কি সে স্বেচ্ছায় ভালো থাকবে না? ‘গেট ওয়েল সুন’ না বললে সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করবে না? ঈশ্বরের কাছে চাওয়াটা যদি হাস্যকরই হয়, তাইলে এসব ফাঁকা শুভকামনা কি আরও হাস্যকর না? এইভাবে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট রঙের জামা পরা, কোনো সৌধে ফুল দেওয়া, লাশকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা জানানো.... এগুলা সবই সেক্যুলার রিচুয়ালের একেকটা উদাহরণ। কয়টা বলব?”

নাবিলা নীরব।
“দোস্ত, আমার পুরো আলাপের মূল পয়েন্ট এইটাই,” বলল সন্ধানী, “বস্তুবাদী দাবিদাররা দিন শেষে আসলে পুরোপুরি বস্তুবাদী হইয়া উঠতে পারে না। নিজেরা যেই নৈতিকতার কথা বলে, ধর্মেও আসলে সেই নৈতিকতার কথাই আছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে অর্থহীন বলে ছাইড়া আসে, তারপর ঠিকই অন্য কোনো আচার-অনুষ্ঠানে জড়ায়ে পড়ে। আমাদেরকে ঘুরেফিরে ধর্মের দিকেই আসা লাগে, নাবিলা।”

ভাড়ার টাকাটা নিয়ে শার্টের পকেটে হাত ঢোকাল রিকশাওয়ালা। সন্ধানী বলল, “লাগবে না, মামা। পুরোটাই রাখেন।”
অর্ধেকটা টাকা একরকম গছিয়ে দিয়ে রিকশাওয়ালা বলল, “এডা ওই নাস্তেক-মোর্তাদ খালারে ফিরত দিয়েন। ওনার থিকা ভাড়া রাখুম না। আগে জানলে রিকশায়ই তুলতাম না।”
দু-হাত তুলে শান্ত করার ভঙ্গিতে সন্ধানী বলল, “ঠিকাছে, মামা।”
রিকশা টান দিতে নিয়েও আবার থেমে লোকটা বলল, “আর হুনেন, আমরা নামাজ ফড়ি আল্লাহয় হুকুম দিছেন হেইল্লাইগ্যা। দ্বীন হইল সহজ, এত কডিন কইরা কওনের কিছু নাই।”
“জি, আচ্ছা। থ্যাংক ইউ, মামা।”

ঝরাপাতা

বিকেলের টিউশনিটা এখন আর নেই। স্টুডেন্টের পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। সবুজ সরণিতে যেতে তাই এখন কোনো বাধা রইল না সন্ধানীর।

সরণি আসলে আগের মতো সবুজ নেই, হলদেটে হয়ে এসেছে। সন্ধানী ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে 'আজাদ সংঘ' অনেক অ্যাক্টিভ ছিল। নিয়মিত পাঠচক্র হতো, হতো কাব্যসন্ধ্যা, অন্তর্জালে ছিল তাদের সংঘবদ্ধ সরব বিচরণ। কয়েকজন শিক্ষকও মাঝে মাঝে হাজিরা দিতেন। তুখোড় সিনিয়রদের অনেকেই এখন পড়ালেখা শেষ করে নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। জুনিয়রদের মধ্য থেকে সেই শূন্যস্থান পূরণ করার মতো তেমন কেউ উঠে আসেনি। সন্ধানীর মতো অনেকে স্বেচ্ছায় দলছুট হয়ে গেছে। অনলাইন-অফলাইনে আচমকা বেড়ে গেছে ধর্মান্ধদের দৌরাত্ম্য। এমন বেশ কিছু বাধা-বিপত্তির কারণে আজাদ সংঘের কাজকর্ম স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।

অনেকদিন পর আজ তারা আবার একত্র হচ্ছে সবুজ সরণিতে। সিরিয়াস কোনো মিটিং না। আড্ডা, কথাবার্তা আর স্মৃতিচারণ। সন্ধানীকেও আসতে বলা হয়েছে। পুরনো বন্ধুত্বের টানে সন্ধানীও না করেনি। দেখা গেল সে-ই সবার আগে পৌঁছে গেছে সবুজ সরণিতে। এরপর একে একে কানিজ, ফয়সাল, শুভ, নাবিলা, সত্যজিৎ, কমল চাকমা, রাশেদ ভাইয়া আর দ্যুতি আপু এলেন।

সত্যজিৎ আর কমল ছেলে দুটো সন্ধানীর বেশ নজর কাড়ে। এরা এতই হ্যাংলা-পাতলা, মনে হয় যেন সন্ধানীও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারবে। আজাদ সংঘে ওদের মতো জুনিয়র ছেলেমেয়েগুলো যত না মুক্তবুদ্ধির চর্চার জন্য আসে, তার চেয়ে বেশি আসে 'সিদ্ধি' লাভের আশায়। সরাসরি বলাও যায় না, "ভাই রে! আর গাঞ্জামাঞ্জা খাইস না। এমনে চলতে থাকলে তো শুকাইয়্যা শুকাইয়্যা মইরা যাবি কয়দিন পর।" কারণ, অপরের ব্যক্তিগত আচরণ নিয়ে খবরদারি করা আজাদ সংঘে একেবারেই নিষিদ্ধ।

সবার মধ্যে হায়-হ্যালো শেষে মোস্ট সিনিয়র হিসেবে রাশেদ একে একে সবার বর্তমান অবস্থার খোঁজখবর নিতে লাগল। "কীরে ফয়সাল? ছ্যাঁক খাওয়ার পর জীবন কেমন কাটতেছে তোর?"

"আরে ওইসব **র না, ভাই। প্রেম জীবনে আসবে-যাবে। এত চিন্তার কী আছে?" ফয়সালের জবাব।

"এহ! দিনের পর দিন হাহাকার মার্কা স্ট্যাটাস দেয়, আবার ভাব দেখায়।" রাশেদের পাশ থেকে বলল দ্যুতি। হেসে উঠল সবাই।

"এইসব প্রেম-টেমে না জড়ানোর জন্যে ফয়সাল ভাই তো নিয়মিত আমাদের কানপড়া দেয়," কমল বলল, "লেজ কাটছে, কী আর করবে বেচারা!"

সত্যজিৎ বলল, "হুম, আমিও সাক্ষী আছি।"

"হপ! তোদের দুইটা বোক**রে আর কখনও সিগারেট দিব না।" হুমকি দিল ফয়সাল।

“সিগারেটের হুমকি দেখানো ছাড়, ফয়সাইল্যা,” নাবিলা বলল, “পয়সা কামা রাশেদ ভাইয়ার মতো।”

“হুম, দেখিস না, দ্যুতি আপুর সাথে রাশেদ ভাইয়ার কত লং টাইম রিলেশন?” যোগ করল কানিজ। আবার সকলের এক চোট হাসি।

“থাপ্পড় খাবি,” দ্যুতি চোখ পাকাল, “আমি মোটেও টাকার জন্য প্রেম করি না, হুঁহ!”

শুভ বলল, “আপু কি নিজের টাকার অভাব আছে নাকি?”

সন্ধানী মুখ খুলল, “আচ্ছা আপু, *আলো* প্রজেক্ট কি এখনও রানিং?”

দ্যুতি ওর দেশের বাড়িতে অন্ধ শিশুদের উপযোগী নানা রকম কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়ার একটি প্রজেক্ট চালায়। নাম ‘আলো’। দ্যুতি বলল, “কোনোমতো চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। দেখি, গরমের ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে আরেকটু স্পিড আপ করা যায় কি না।”

ফয়সাল বলল, “আচ্ছা সন্ধানী, একটা কথা।”

“হ্যাঁ, বল।”

“এই যে দ্যুতি আপু, রাশেদ ভাইরা নাস্তিক হয়েও গরিবদের পাশে দাঁড়াইতেছে, এই বিষয়টারে তুই কীভাবে দেখিস? ওরাও কি মরার পর নরকে যাবে নাকি?”

রাশেদ বলল, “দাঁড়া দাঁড়া, কী বলি শোন। আলোচনা চলবে। কিন্তু মনে রাখবি, সন্ধানী কিন্তু এইখানে একা, আর তোরা পাঁচ-ছয়জন। সবাই মিলে হামলে পড়বি না ওর উপর। তোরা মিলে যেটুকু সময় পাবি, সন্ধানী ততটাই পাবে।”

“আর কথার মাঝখানে একজন আরেকজনকে থামায়া কথা বলতে শুরু করিস না কেউ, প্লিজ। এইটা খুবই বিরক্তিকর।” যোগ করল দ্যুতি।

কমল বলল, “ভাই, আমার একটা পয়েন্ট।”

“বল।”

“ওয়ারেন বাফেট আর বিল গেটস দুইজন কিন্তু নাস্তিক। বাফেট উনার সম্পদের প্রায় ৯৯% চ্যারিটিতেই খরচ করবেন বলতেছেন। আর বিল গেটস মনে হয় আজ পর্যন্ত ২৬ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি চ্যারিটি কইরা ফেলছে।” বলে থামল কমল।

“এবার বিপরীত এক্সাম্পল দে।” রাশেদ বলল।

কমলকে দিশেহারা দেখাল। সত্যজিৎ বলল, “আরে বোক**না! ধার্মিক এমন কারও উদাহরণ দে, যিনি একদম কিপ্টা। যেমন প্যাট রবার্টসন।”

“চিনি না।” কমল বলল।

“ধুরো বোক**!” রাশেদের গালি। “ওই সত্য, তুই বল।”

সত্যজিৎ বলল, “প্যাট রবার্টসন সবচেয়ে ধনী খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক। চ্যারিটিতে তো নাই-ই, উল্টা আফ্রিকায় একটা হীরার খনিতে স্লেভ দিয়া কাজ করায়।”

সন্ধানী রাশেদের দিকে তাকাল। রাশেদ মাথা নাড়িয়ে বোঝাল এখন সন্ধানীর বলার পালা।

“ওকে। প্রথম কথা, ঈশ্বর যদি চ্যারিটি করার কারণে বাফেট বা গেটসকে স্বর্গে পাঠান, তাতে আমি বাধা দেয়ার কে? আবার জাস্ট নাস্তিক হওয়ার কারণে যদি তাদের নরকে পাঠায়া রবার্টসনকে স্বর্গে পাঠান, তা হলেও....”

“র যুক্তি!” কানিজ মাঝে দিয়ে বলে উঠল। প্রায় একই সময়ে নাবিলা বলল, “Who the f* is gonna worship such a moron?”

সন্ধানী বলল, “সেইটা তো আমার বক্তব্য না। আমি বুঝাইতে চাচ্ছি যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কাকে শাস্তি দিবেন, সেইটা উনার ব্যাপার। অথবা তুই-আমি তাকে পূজা করলাম কি করলাম না, এইটাও ঈশ্বরের থাকা না-থাকার কোনো প্রমাণ না। আরেকটা ব্যাপার হলো...”

“কিন্তু দিদি....” শুভ বলতে নিল।

“এই তোরা কিন্তু কথার মাঝে ইন্টারাপ্ট করতেছিস।” সতর্ক করল রাশেদ।

“একটা পয়েন্ট জাস্ট, রাশেদ ভাই। কোনো কিছুই ঈশ্বরের থাকা না-থাকার প্রমাণ না বইলা এভাবে প্রায়ই ধার্মিকরা পিছলায়া যায়। তো ঈশ্বর থাকলেও লাভটা কী হইল?”

“এই পয়েন্টেই আমি আসছিলাম,” বলল সন্ধানী, “কীভাবে কতটুকু সম্পদ আয় আর ব্যয় করলে সবার কল্যাণ হবে, তা গডের জানার কথা। তিনি মানুষকে সেরকম গাইডলাইন দিয়ে দেবেন। ক্যাপিটালিজমে ধনী আরও ধনী হয়, গরিব আরও গরিব। এইটা তো স্বীকার করিস, নাকি?”

“হুম... এখন আবার বইলেন না যে ঈশ্বর কমিউনিস্ট।”

“না, সেইটা বলব না...” সবার সশব্দ হাসি উপেক্ষা করে বলল সন্ধানী, “কিন্তু এটা তো ঠিক যে, খুব সিস্টেমেটিক্যালি ধনী-গরিবের এই পার্থক্য বাড়তেছে। সেই সিস্টেমের ভিতরে থেকে বাফেট বা বিল গেটস যত পয়সা কামাচ্ছেন, প্রতিটা পয়সার বিপরীতে কেউ-না-কেউ গরিব হচ্ছে। খুব সিস্টেমেটিক্যালি। পয়সা কামানোর পর তারা সেখান থেকে বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন চ্যারিটি করতে লাগলেন। এইটা কিন্তু সিস্টেমেটিক্যালি না, র‍্যান্ডমলি। শুধু উনাদের না, আমাদের সবার ক্ষেত্রেই এই ব্যাপারটা খাটে। সবজান্তা ঈশ্বর আমাদেরকে সুন্দর একটা সিস্টেম জানায়ে দিবেন। মানুষ টাকাও কামাবে, চ্যারিটিও করবে। কিন্তু দুটাই হবে সিস্টেমেটিক। আমার বিশ্বাস, তখন বিল গেটস লেভেলের ধনী তৈরি না হলেও আরেক প্রান্তে কেউ না-খেয়েও মরবে না। এখন ধার্মিকরা যদি সেই সিস্টেম অ্যাপ্লাই না করতে পারে, সেটা গডের দোষ না।”

কানিজ বলে উঠল, “অথবা সবাইকে আগে থেকেই মধ্যবিত্ত বানায়ে দিলে ঝামেলাটা আরও সহজে মিটে যাইত, ঠিক না?”

সন্ধানীকে দেখে মনে হলো কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে। তাকে আমতা আমতা করতে দেখে রাশেদ বলল, “ধরলাম, তোর কথামতো গড সর্বশক্তিমান, সবজান্তা ইত্যাদি। কিন্তু পৃথিবীতে কত গরিব-দুখী, কত খুনখারাবি, কত অপরাধ। সেই আদিকাল থেকে এগুলা আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। তোর গডের কাজ কি খালি সিস্টেম বইলা দেওয়া? এতই যখন ক্ষমতা, নিজে কিছু করে না কেন?”

নাবিলা যোগ করল, “ঈশ্বর যা করেন, ভালোর জন্য করেন।” শুনে হেসে উঠল সবাই।

সন্ধানী শুকনো হাসি দেওয়ার চেষ্টা করল। দুর্বল গলায় বলল, “যা-ই হোক। মানুষের বানানো সিস্টেমের চেয়ে ঈশ্বরের দেওয়া সিস্টেম বেশি ইফেক্টিভ হওয়ার কথা, এইটাই আমার পয়েন্ট।”

“যদি আদৌ দিয়ে থাকে আরকি।” সাথে সাথে কাউন্টার দিল সত্যজিৎ। সন্ধানী চুপ হয়ে গেল।

এক সেকেন্ড সবার দিকে তাকিয়ে রাশেদ দেখল কারও কিছু বলার আছে কি না। তারপর বলল, “আচ্ছা, এই পয়েন্টে আরও কথা হবে। তার আগে চা-বিরতি। অ্যাই, মোসাদ্দেক মামা! এইদিকে আসো।”

ক্যাম্পাসের বিখ্যাত চা-অলা মোসাদ্দেক এসে সবাইকে চা পরিবেশন করে গেল। সন্ধানী ছাড়া সবাই এখন বেশ হাসিখুশি। বলা চলে খেলার প্রথমার্ধেই সন্ধানী বেশ পিছিয়ে গেছে। রাশেদের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে বিরতির পর ব্যবধান আরও বাড়বে।

চা শেষে সিগারেট ধরাল কেউ কেউ। রাশেদ বলল, “হ্যাঁ, তো যেটা বলতেছিলাম। যে-কোনো বিষয়ে মানুষের দেওয়া থিওরির চেয়ে আসমান থেকে ডাউনলোড-করা থিওরি বেশি নিখুঁত হবে, রাইট?”

“হ্যাঁ।” সন্ধানীর কণ্ঠে এখনও তেমন জোর নেই।

“তা হলে হিজাবি মেয়েরা রেইপড হয় কেন?”

শুভ হাত তুলল রাশেদের দিকে তাকিয়ে। অনুমতি পেয়ে বলল, “বাংলাদেশে হিজাবের তাণ্ডব যেই অনুপাতে বাড়তেছে, ধর্ষণও কিন্তু একই রেটে বাড়তেছে। অথচ একসময় এই দেশের মহিলারা এক প্যাঁচে শাড়ি পরত। পুকুরে গোসল করে ভিজা কাপড় নিয়াই বাসায় ফিরত। কই? তখন তো এত ধর্ষণ ছিল না। সন্ধানী দি', কী বলেন?”

“অস্থির!” অস্ফুট স্বরে বলল কানিজ। সত্যজিৎ প্রায় হাততালি দিয়ে ফেলতে নিল।

“ক্যামনে কী?” সন্ধানী প্রায় চিৎকার করে উঠল, “এক প্যাঁচে শাড়ি পরার আমলে পলিগ্যামি ছিল, বাল্যবিবাহ ছিল, স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রথা ছিল। বাংলায় যেন এটাকে কী বলে...?”

“সতীদাহ।” চট করে বলে উঠল রাশেদ।

“হ্যাঁ, হ্যাঁ। সতীদাহ। এইগুলার কথাও বল....” বেশ উঁচু স্বরে বলল সন্ধানী।

“এইটা তো কোনো আর্গুমেন্ট হলো না।” নাবিলা বলতে শুরু করল, “শুভ যেটা বলসে, আগে সেটা রিফিউট কর সরাসরি।”

“এইটাও রিফিউট করা লাগে? অতীতের কোনো পরিসংখ্যান আমাদের হাতে আছে? তা হলে তো বলতে হয়, পাকিস্তান আমলে এখনের চেয়ে রেইপ কম হইতো। আর শুভ যেই যুগের কথা বলল, তখন রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান ছিল সামাজিক কমিউনিটিগুলা। একটা গোত্রের ছেলে আরেকটা গোত্রের মেয়েকে রেইপ করলে দুইটা গোত্রের মধ্যে মারপিট লেগে যাইত। এই জিনিসটাই তখন সামাজিক অপরাধগুলাকে চেক দিয়া রাখত। দুইটা যুগের তুলনা কীভা.....”

সত্যজিৎ বলল, “দিদি, আসমান-থেকে-ডাউনলোড-করা ‘হিজাব সিস্টেম' যে ধর্ষণ ঠেকাইতে পারে না, ওইটা ছিল মূল পয়েন্ট। আপনি তো সেইখান থেকে কৌশলে সইরা গেলেন।”

“সরে যাই নাই। পোশাক ধর্ষণ ঠেকাতে পারে না, মানলাম। কিন্তু আমরা যেই বিকল্প সমাধান দিচ্ছি, সেটাও তো হাইপোথেটিক্যাল। ব্যাগের ভিতর ছুরি, অ্যান্টিকাটার, সুঁই, সেফটিপিন; পিপার স্প্রেও রাখতে বলা হইতেছে। পোশাক ধর্ষণ থামাইতে পারে না, কিন্তু সিকিউরিটি লেভেল বাড়ায়। ছুরি, কাঁটা-চামচের কাজও একই। ইনফ্যাক্ট, দুই-তিনটা ধর্ষক যখন ফুল প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসে, তখন ব্যাগ থেকে সেফটিপিন বাইর করতে করতেই তো....”

ফয়সাল বলল, “ছুরি-চাকু বাদ দে। অ্যাটলিস্ট, মার্শাল আর্ট জানা থাকাটা যে পোশাকের চেয়ে বেশি ইফেক্টিভ, নাবিলাই তো এইটার প্রমাণ।”

“হ্যাঁ, কিন্তু নাবিলা গ্রিন বেল্ট। রেপিস্ট যদি ইয়েলো বা ব্ল্যাক বেল্ট হয়?”

শুভ দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, “দিদি, মাথায় একটু পানি ঢালেন। আমরা কি ব্যাগে ছুরি রাখা বা মার্শাল আর্ট শেখাটারেই একমাত্র সমাধান বলি? এইগুলা জাস্ট সেফটি মেজারমেন্ট। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা হলো মূল্যবোধের অভাব দূর করা, কড়াকড়ি আইন প্রণয়ন, প্লাস প্রয়োগ করা। সমাধানের একটা উপাদান নিয়া পইড়া থাকলে তো আলোচনা এক জায়গাতেই গড়াগড়ি খাবে। পূর্ণাঙ্গ সমাধান নিয়া কথা বলতে হবে।”

“এক্স্যাক্টলি, এই কথাটাই ধর্মগুলার ক্ষেত্রেও খাটে।” বলল সন্ধানী, “শোন, ধর্ম জিনিসটা আসলে কিছু বেসিক ইনস্ট্রাকশন। আমরা এমন অনেক কাজ করি, যেগুলার কথা ধর্মগ্রন্থে নাই বা ধর্মগুরুরা বলে যায় নাই। কিন্তু সেগুলা করতে তো নিষেধও করা হয় নাই। ব্যাগে ছুরি রাখা যে অধর্ম, এটা কে বলল? নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি এগুলার কথা তো বেশিরভাগ ধর্মে আছেই। কিছু ধর্মে পেনাল কোডও আছে.... তা ছাড়া মূল্যবোধ আমাদের কাছে সাবজেক্টিভ। একেক সময়, একেক জায়গায়, একেকজনের কাছে একেকরকম। সেই তুলনায় এদের ধর্মীয় সংজ্ঞাগুলা অনেকটা স্থিতিশী....”

দ্যুতিকে হাত তুলতে দেখে থেমে গেল সন্ধানী। দ্যুতি বলল, “না, না, তুই শেষ কর। তুই শেষ করার পর একটা কথা বলতাম, এ জন্য হাত দেখালাম।”

"আমার শেষ, আপনি বলেন, আপু।" বলল সন্ধানী। অন্য সবার চেয়ে রাশেদ আর দ্যুতি অনেক শান্তভাবে কথা বলে। তাই তাদের কেউ কথা বললে অন্যরা চুপ না করে পারে না। এ দুজনের প্রতি সন্ধানীর আবেগটাও অন্যরকম।

দ্যুতি বলতে শুরু করল, "সাবজেক্টিভিটির যে উদাহরণটা দিলি, সেটা ঠিক হয় নাই। ধর্মের কড়াকড়ি সংজ্ঞাগুলাই বেশি প্রবলেম্যাটিক। সেক্যুলার নৈতিকতা প্রাধান্য দেয় ব্যক্তির সম্মতিকে। রিলেশনের দুই পক্ষের মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক কি না, আর দুইজনই রাজি কি না। জেন্ডার বা বয়স কোনো বাধা না। ধর্ম সেখানে আরও অনেক নিয়মের বোঝা চাপায়ে দেয়।"

"জি।"

"ধর্ম কিন্তু শুধু সম্মতিতে খুশি না। ধর্মে একটা রিলেশন জায়েজ করতে হলে বিয়ে নামক একটা রিচুয়ালের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ইভেন কিছু ধর্মে তো মেয়ের সম্মতি ছাড়া খালি আচার-অনুষ্ঠানগুলা পালন করলেই বিয়া হয়ে গেছে বলে ধরে নেয়া হয়। এইখানে মানুষের চেয়ে আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বেশি! হোয়াট ডু ইউ থিংক? Consent আর social acceptance-এর মধ্যে কোনটা বেশি যৌক্তিক?"

"এখন আবার বলিস না যে কনসেন্টও সাবজেক্টিভ। মেয়ে চুপ কইরা ছিল, তার মানেই সম্মতি দিয়া দিছে—এইসব হাবিজাবি কথা তুলিস না।" কানিজ বলল।

সন্ধানী জবাব দিতে পারল না। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল, "কনসেন্ট বেশি যৌক্তিক।"

রাশেদ বলল, "হুম। এরকম গভীরে গিয়ে দেখলেই বুঝবি যে-কোনো ব্যাপারেই ধর্মীয় সমাধানগুলার চেয়ে সেকুলার সমাধানগুলাই বেশি যৌক্তিক। আসমানে-বসা গডের চেয়ে মানুষই মানুষের সমস্যা আর সমাধানগুলা ভালো বোঝে।"

সন্ধানী মাথা নাড়ল কেবল।

শুভ-ফয়সাল-কানিজ-নাবিলা-সত্যজিৎ-কমলদের হাসি আরও চওড়া হলো। আলোচনার কোনো অংশেই সন্ধানী আজকে সুবিধা করতে পারেনি।

সন্ধ্যার আজান হয়ে গেছে অনেক আগে। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। ফয়সাল ফোনের লক খুলল। গ্যালারি ওপেন ছিল। স্লাইড করে ট্যাব ক্লোজ করে বলল, "সাতটা দুই বাজে। উঠবেন নাকি আজকে?"

কেউ কিছু বলার আগেই নাবিলা ভ্রু কুঁচকে বলল, "ফয়সাল... তোর... তোর গ্যালারিতে দ্যুতি আপুর ছবি।"

কথাটা কানে আসা মাত্রই দ্যুতির মাথাটা বোঁ করে ঘুরে উঠল। ফয়সাল এমন মানুষ, যে সবাইকে ঘোষণা দিয়েই ল্যাপটপ আর ফোনে পর্ন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

কৌতূহলী সব মাথা একসাথে ঘুরে গেল ফয়সালের দিকে। ফয়সাল স্বাভাবিক স্বরে বলল, "হুম। ফেসবুক থেকে ডাউনলোড করে রাখসি।"

সবার মাঝে কেমন অস্বস্তিকর নীরবতা। দ্যুতি জোর করে হাসি দিয়ে বলল, “কেন রে? সবার পিক ডাউনলোড করিস নাকি?”

“না, আপু। আপনারটাই খালি। আপনার চেহারা ভালো লাগে, তাই।”

কানিজ বলল, “আপুর অনুমতি না নিয়ে ডাউনলোড করা কি ঠিক হলো, ফয়সাল?”

রাশেদকে হতভম্ব দেখাচ্ছে। ফয়সাল তখনও একদম স্বাভাবিক স্বরে বলল, “এগুলা ফ্রেন্ডস প্রাইভেসি দেয়া ছবি। আর আমি দ্যুতি আপুর ফ্রেন্ডলিস্টে আছি। তার মানে আমার এগুলো ডাউনলোড করার পারমিশন আছে।”

কমল বলল, “না, না, ফয়সাল ভাই। এইটা ঠিক না। আপু আমাদের সবার বড়ো, বোনের মতো।”

“তো?”

শুভ আমতা আমতা করল, “আপনি তো... আপনি তো নিশ্চয় এসব ছবি....”

“হুম, কাউকে দেখাই না। জাস্ট নিজের চাহিদা মেটাই।” নির্লিপ্ত ফয়সাল।

“ফয়সাল!” চিৎকার দিয়ে উঠল রাশেদ, “এইবার কিন্তু বেশি হয়ে যাইতেছে!”

“আরে আজিব!” ফয়সাল এবার একটু উত্তেজিত। “হঠাৎ হঠাৎ আপনারা ধার্মিকদের মতো কথা বলা শুরু করেন। আপনি বা আপু যদি বলেন ডিলিট করতে, তা হলে ডিলিট কইরা দিব। হোয়াই সো সিরিয়াস?”

সন্ধানী হঠাৎ কথা বলে উঠল, “অফকোর্স! দ্যাট'স দ্য ব্লাডি পয়েন্ট! ফেসবুকে আপলোড করা ছবি। তার মানেই সম্মতি। কারও ক্ষতি না করে সেগুলা ডাউনলোড করে যাচ্ছে-তাই করা যাবে, শুধু কোনো পর্নসাইটে আপলোড না করলেই হলো।”

“হ্যাঁ, সহজ ব্যাপার।” ফয়সাল আবারও স্বাভাবিক।

“হোলি শিট, ম্যান!” সন্ধানী বলে চলল, “Secular morality strikes!”

বাকরুদ্ধ হয়ে চেয়ে আছে সবাই। দ্যুতির হাত ধরে টেনে নিয়ে হঠাৎ হনহন করে হেঁটে চলে গেল রাশেদ। নাবিলা আর কানিজের চোখে অদ্ভুত ঘৃণা। জুনিয়র হওয়ায় কিছু বলতে না পারা শুভ, সত্যজিৎ আর কমল মানে মানে কেটে পড়তে লাগল। সবুজ সরণির অবশিষ্ট সব ক'টা পাতা যেন একে একে ঝরে পড়ল।

সন্ধানী একটু পর বলল, “You guys are badly in need of some religion, dudes!”

শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস

শামীম মীম স্যারের ক্লাসটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে। সবাই বিরক্তি প্রকাশ করে যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। সন্ধানী আর ইলমা প্রায় একই সময়ে ডাক দিল একজন আরেকজনকে। অজয় স্যারের দেওয়া গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্টের কাজটা নিয়ে বসা লাগবে।

ইলমা হাত উলটে বিরক্তির স্বরে বলল, “রিয়াদ শালাটা কই?”

সন্ধানী জবাব দিল, “শোন, রিয়াদের আশায় বইসা থাকলে কাজ কিচ্ছু আগাবে না। তুই আমার হলে চল। আমার ডেস্কটপে কাজ করব।”

এমন সময় রিয়াদ এসে দেখল পুরো ক্লাসরুম বিক্ষিপ্ত। সন্ধানীদের দিকে ফিরে বলল, “শামীম স্যারের ক্লাস হবে না?”

সব সময় হিপ পকেটে করে একটা খাতা-নিয়ে-ক্লাসে-আসা রিয়াদকে সন্ধানী বলল, “এত ভারি ব্যাগ কান্ধে নিয়ে আসলি কী মনে করে?” ইলমা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, “ক্লাস ক্যান্সেল হোক আর যা হোক, তুই এক্ষণ আমাদের সাথে বসবি। অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে তারপর উঠবি।”

“অফকোর্স!” বলে কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামাল রিয়াদ। ভেতর থেকে ল্যাপটপটা বের করে গ্রুপমেটদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, “এই নে, ধর। কাজ শুরুর করে দে।”

“আপেল কিনলি কবে?!” ইলমার বিস্ময়।

জবাব না দিয়ে রিয়াদ স্বভাবসুলভ তেল মারা ভঙ্গিতে বলতে লাগল, “সব কাজ এটাতে কর। ডিপার্টমেন্টের ওয়াইফাই কাজ না করলে আমাকে বলবি। আমার রুমে ব্রডব্যান্ড আছে। কোনো চিন্তা করবি না। আমি একটু আসতেছি।”

“সিগ্রেট খেতে যাচ্ছিস, না?” ইলমা মুখ ভেঙচি দিয়ে বলল।

কোনো জবাব দিল না রিয়াদ। কেবল মুখ বাঁকা করে একটা হাসি দিল।

“তোর রুমে আমাদেরকে ঢুকতে দিবে?” বলল সন্ধানী।

রিয়াদ চোখেমুখে বিস্ময় ফুটিয়ে নিজের বুক চাপড়িয়ে বলল, “দিবে না মানে? হলের গার্ডকে যদি বলিস—তোরা আমার... এই রিয়াদ হাসানের ফ্রেন্ড... কার বাপের সাধ্য যে তোদের আটকায়.....”

ইলমা বলল, “হইছে হইছে, আর হিরোর পার্ট নিতে হবে না। তুই হুক্কা টেনে আয়, যা।”

চলে গেল রিয়াদ। রিয়াদ চলে যাওয়াতে তার দুই গ্রুপমেট খুশিই হলো। যে যেই কাজ পারে, সে সেটাই করুক। অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে রিয়াদ কোনো কাজে আসবে না, তা তারা জানে। ল্যাপটপ দিয়ে গেছে, এটাই অনেক।

অজয় স্যার অ্যাসকাইলাসের একটা নাটক পড়াবেন। *Prometheus Bound*। টেক্সটে ঢোকার আগে গ্রিক মিথোলজির এই চরিত্রটাকে নিয়ে একটা অ্যাসাইনমেন্ট করতে দিয়েছেন। ইলমা

নেটে ঢুকে সার্চ দিল। যা যা কপিপেস্ট করা লাগে, তা সে করবে। আর যা যা কাগজে টুকে রাখতে হবে, তা সন্ধানী লিখবে।

ইলমা কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করে বলল, "কী জগাখিচুড়ি অবস্থা! প্রমিথিউস মিথের চার রকমের ভার্শন আছে। কোত্থেকে কতটুকু কপি করব, তা-ই তো বুঝতে পারতেছি না।"

"আচ্ছা তুই সারমর্ম আমাকে বল।" সন্ধানী বলল।

ইলমা আরও কিছুক্ষণ চোখ বোলানোর পর বলল, "আচ্ছা। প্রমিথিউস ছিল গ্রিক মিথোলজির একজন টাইটান। টাইটানদের সাথে গডদের যে যুদ্ধ হয়, সেখানে সে পার্টিসিপেট করে নাই। সে জিউস-সহ অন্যান্য গডদের পক্ষেই ছিল বলা যায়। বাপমা, বংশ হ্যানত্যান নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে, এইগুলা পরে কপি করা যাবে।

সবচেয়ে বিখ্যাত পার্টটা হলো মানবজাতি আগে আগুনের ব্যবহার জানত না। প্রমিথিউস গডদের থেকে আগুন চুরি করে এনে মানুষদের দেয়। জিউস রেগে গিয়ে তাকে শাস্তি হিসেবে ককেশাসের একটা পাহাড়ে বন্দি করে রাখে। সেখানে একটা ঈগল প্রতিদিন তার হৃৎপিণ্ড ঠুকরে খায়..."

"ইয়াক!" সন্ধানী বলল।

ইলমা বলে যাচ্ছে, "রাতের বেলা প্রমিথিউস আবার সুস্থ হয়ে যায়। পরদিন থেকে আবার শাস্তি শুরু হয়। এভাবে অনন্তকাল চলতে থাকে। ঘটনাক্রমে একদিন হারকিউলিস তাকে উদ্ধার করে। আর্ট, লিটারেচার, সায়েন্স, আর্কিটেকচার ইত্যাদি বিভিন্ন ফিল্ডে প্রমিথিউসকে জ্ঞান আর সভ্যতার সিম্বল হিসেবে দেখা হয়।"

এক ঘণ্টার ভেতর দুজন মিলে নোট করা, কপি করা, টাইপ করা-সহ সব কাজ সেরে অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করে ফেলে। তৃপ্তির শ্বাস ফেলে ল্যাপটপটা বন্ধ করল ইলমা। অ্যাপলের লোগোটা দেখিয়ে সন্ধানী তাকে বলল, "এই লোগোটা নাকি অ্যাডাম আর ইভের ওই ফল খাওয়ার কাহিনি থেকে আইডিয়া নিয়ে বানানো? জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর মানুষ সব রকম বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির জ্ঞান পায়। স্টিভ জবস ওইখান থেকেই নাকি অ্যাপলের লোগোর আইডিয়াটা নিছেন?"

"জানতাম না তো!" বলল ইলমা, "গন্দম ফল কি তা হলে আপেল ছিল?"

"তোদের ধর্মের ব্যাপার। আমি কী জানি? গন্দম কি আপেলের আরবি? নাকি জ্ঞানবৃক্ষের?"

ইলমা বিব্রতভাব কাটিয়ে বলল, "আচ্ছা চল, গুগল করি।"

আবার ল্যাপটপ অন করা হলো। কিন্তু বানানটা কি 'গন্দম' নাকি 'গন্ধম' এটা নিয়েই দ্বিধায় পড়ে গেল ইলমা। সন্ধানী ইতোমধ্যে একবার অপমান করেছে নিজের ধর্ম সম্পর্কে কম জানায়। বিপদ এড়াতে ইংরেজিতে *fruit of knowledge* লিখে সার্চ দিল।

উইকিপিডিয়ায় *Tree of the knowledge of good and evil* পাতায় ঢুকে পড়তে লাগল দুজনই। প্রথম প্যারা পড়ে সন্ধানী বলল, "প্রমিথিউস মিথের সাথে কী দারুণ মিল না? দুই জায়গাতেই

মানুষ পাপের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করে। ঈশ্বর সহ্য করতে না পাইরা মূল হোতাকে শাস্তি দেয়। কিন্তু ঈশ্বর কেন জ্ঞান আর পাপকে এক কইরা দেখবেন?”

ইলমা কী জবাব দেবে, ভেবে পেল না।

আরও নিচে স্ক্রল করে তারা দেখল এ ঘটনাটা নিয়ে ইয়াহুদিধর্ম, খ্রিস্টানধর্ম আর ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা করে লেখা। বিপত্তি বাঁধল ইসলামের অংশটাতে এসে।

সন্ধানী বলল, “অ্যাই, এখানে তো বলসে কোরানে জ্ঞানবৃক্ষ বইলা কোনো নাম উল্লেখ নাই। শুধু বলা আছে ‘ওই গাছ’। আর শয়তান আদম-হাওয়াকে ফুসলানোর জন্য বলসিল, এই গাছের ফল খেলে অমর এঞ্জেল হওয়া যায়।”

ইলমা নিজেই তখন এই তথ্য নতুন জানল। উত্তর দেবার মতো কিছু পেল না। শুধু বলল, “আমিই তো জানতাম হজরত আদম-হাওয়া বেহেশতে উলঙ্গ ছিল। গন্দম খাওয়ার পর উনাদের লজ্জার অনুভূতি তৈরি হয়। কিন্তু এখানে তো বলল ফল খাওয়ার পর নাকি উনাদের পোশাক খুলে গিয়ে লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে যায়। সূরা আরাফের ২৭ নং লাইনের রেফারেন্স দেওয়া। বাইবেল আর কুরআনের কাহিনিগুলাতে যে এত খুঁটিনাটি পার্থক্য, তা আজকে জানলাম।”

আপেল-রহস্যের এখনও সমাধান হলো না। আবারও উপরে-নিচে স্ক্রল করল কিছুক্ষণ। সন্ধানী একটা জায়গায় আঙুল রেখে বলল, “এই যে পাইসি। আগেরবার দ্রুত পড়ে যাওয়ায় মিস করসিলাম। এখানে বলা হইসে ধর্মগ্রন্থের কোথাও আপেলটাপেলের কথা বলা হয় নাই। শিল্পীর কল্পনার তুলিতে ফলটা আপেল হয়ে গেসে।”

“আচ্ছা,” ইলমা বলল, “গন্দম জিনিসটা নিয়েও একটু ঘাঁটাঘাঁটি করি।”

সার্চ দিতেই নানারকমের রেজাল্ট এল। মুক্তমনা ব্লগের কিছু লেখাতেই কেবল গন্দম নামটার উল্লেখ পাওয়া গেল, অবশ্য কোনো রেফারেন্স নেই ওদের লেখায়। এ ছাড়া মুসলিম স্কলারদের লেখা বই আর মুসলিম লেখকদের লেখা ব্লগের যেসব রেজাল্ট এল, সেগুলোর প্রত্যেকটাতে বলা হচ্ছে—গন্দমের কথা কুরআনে নেই, বরং এটি অজ্ঞ মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত একটা ধারণা। এটি নাকি ফার্সি শব্দ, যার অর্থ গম। ‘গম গাছের ফল’ কথাটা ভাবতেই হাসিতে ফেটে পড়ল দুজন।

“এক মিনিট!” তুড়ি বাজাল সন্ধানী, “তোরা যেন কোরান নাজিল হওয়ার আগের যুগটাকে কী বলিস?”

“নাজিল হওয়ার আগের যুগ। ‘আইয়ামে জাহেলিয়াত’। কেন? হঠাৎ?”

“I am a what?”

“আইয়াম, আইয়াম। মানে যুগ। ‘আইয়ামে জাহেলিয়াত’ মানে ‘অজ্ঞতার যুগ’।”

“এই তো মিলতেছে। তোদের ধর্মে জ্ঞানকে পাপের সাথে তুলনা করা হয় নাই। বরং অজ্ঞতাকে ধর্মের বিপরীত শব্দের মতো দেখানো হইছে। তোর নিজের ধর্মের এত সুন্দর একটা তথ্য তুই নিজেই ধরতে পারলি না!”

“হুম, বোঝা উচিত ছিল। কুরআনের প্রথম নাজিল হওয়া আয়াত হলো اِقْرَأْ [পড়ো]। না পড়ে পড়েই আমার ধর্মীয় নলেজের এই অবস্থা হইসে। এখন গুগল সার্চ করে নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানা লাগতেছে।”

“পড়ো প্রথম লাইন? তাইলে বিসমিল্লা কী?”

“বিসমিল্লাহ সব সূরার শুরুতে আছে। মানে আল্লাহর নামে শুরু করছি। আর সূরাগুলা নাজিল হওয়ার সময় পুরাপুরি সিরিয়াল বাই নাজিল হয় নাই। পরিস্থিতি অনুযায়ী একেক সূরা, একেক আয়াত একেক সময় আসছে। এর মধ্যে সবার আগে নাজিল হওয়া আয়াত হলো اِقْرَأْ, মানে পড়ো.... ওয়েল.... আয়াত তো কুরআনের একেকটা বাক্যকে বলে। এটা সম্ভবত একটা আয়াতের প্রথম শব্দ। ও! মনে পড়েছে! পুরো আয়াতটা হলো, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ [পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন]।”

۝ ١آيه

একটু থেমে আবার বলল, ”আরেকটা মজার কথা শোন। আমার নামওয়ালা একটা বিখ্যাত আয়াত আছে। রব্বি যিদনি ইলমা [رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا]। মানে—হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে...”

তার কথায় ছেদ ফেলল রিয়াদের আগমন। রিল্যাক্সড মুডে হাঁটতে হাঁটতে এসে ঢুকল সে। বলল, “অ্যাসাইনমেন্ট কদ্দূর?”

“শেষ।” ইলমার জবাব।

“ওয়াও! অসাম! আমি জানতাম, তোরা পারবি। লাঞ্চের আগে আর কোনো ক্লাস আছে? চল, আজকে তোদেরকে আমি লাঞ্চ করাব। বল, কোন রেস্টুরেন্টে যাবি।”

ইলমা পেনড্রাইভ ধরিয়ে দিয়ে বলল, “এইটা আগে প্রিন্ট করে আন।”

“প্রিন্ট? আচ্ছা, এক্ষুণি আনতেছি।” একটু গিয়েই আবার ফিরে এসে রিয়াদ বলল, “আচ্ছা, আমার কাছে যে টাকা নাই!”

“একটু আগেই বললি লাঞ্চ করাবি, আর এখন প্রিন্ট করার টাকা নাই?”

সন্ধানী তাদের খুনশুটিতে যোগ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারল না। একটু আগের আলাপগুলো মাথা থেকে মুহূর্তের মধ্যেই উবে গেল।

হোক কলরব

“কিছু কি বুঝলা?” কামরুজ্জামানকে জিজ্ঞেস করলেন ফারজানা।

ইয়ারফোনের একটি অংশ ফারজানার এক কানে, আরেকটি অংশ কামরুজ্জামানের এক কানে। রুম অন্ধকার করে দুজনই ঘুমানোর প্রস্তুতি নিয়েছেন। এমন সময় ফারজানা হঠাৎ এই গানটার কথা তোলেন। কামরুজ্জামানের মনেই ছিল না। ফারজানা শুনছিলেন কপাল-ভ্রু কুঁচকে খুব মনোযোগ দিয়ে, কামরুজ্জামানের দিকে পাশ ফিরে। ওদিকে পাশের বালিশে চিত হয়ে কামরুজ্জামান চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন একটু একটু।

"হুম?" অনেকক্ষণ পর বললেন কামরুজ্জামান।

"হুঁ কী!" বিরক্ত ফারজানা, "কী বুঝলা, সেটা বলো।"

"বোঝার কী আছে? জাস্ট এনজয়।" তারপর নিজেই গুনগুন করতে লাগলেন মোবাইলে বাজতে থাকা গানটা।

Repeat current track অন থাকায় চতুর্থ বারের মতো যখন একই গান শুরু হলো, কামরুজ্জামান সাহেব ততক্ষণে আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। ফারজানা স্বামীর কান থেকে ইয়ারফোন খুলে নিয়ে বারান্দায় চলে গেলেন। মৃদুমন্দ বাতাসে বারান্দার চেয়ারে বসে শুনতে লাগলেন সেই একই গান। মনে পড়ে গেল ভার্সিটিতে আজকের ঘটনার কথা।

নিজের রুমে তালা মেরে প্রফেসর কামরুজ্জামানের রুমে এসে বসে ছিলেন। ক্লাস শেষে কামরুজ্জামান যখন রুমে এলেন, তার পেছন পেছন এল এক মেয়ে। ক্লাস নেওয়ার সুবাদে ফারজানাও চেনেন ওকে। মেয়েটা থার্ড ইয়ারে পড়ে। ওর হাতে কিছু কাগজ আর ছবি। অ্যাটেস্ট করানোর জন্য এসেছে। ফারজানাকে দেখে আদাব দিল মেয়েটা। ফারজানা মাথা নেড়ে বললেন, "ভালো আছ, সন্ধানী?"

"জি, ম্যাম।" হাসিমুখে জবাব দিল মেয়েটা, "আপনি ভালো আছেন ম্যাম?"

"হ্যাঁ।" বলতে বলতে ফারজানা ভাবছেন, বোকা মেয়েটা কেন যে এসব জিনিস সত্যায়িত করতে কামরুজ্জামান স্যারকে বেছে নিল! আমুদে লোকটা এখন *vape* টানতে টানতে ধোঁয়া ছাড়বে আর খেজুরে আলাপ করবে দশ মিনিট। তারপর কলম খুঁজবে পাঁচ মিনিট ধরে, সিল আর স্ট্যাম্পপ্যাড আরও পাঁচ মিনিট।

"ম্যাম, বসতে পারি?" প্রশ্নটা এল কামরুজ্জামানের মুখ থেকে। সন্ধানী ফিক করে হেসে ফেলে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। ফারজানা—দেখেছ অবস্থা—টাইপের একটা মুখভঙ্গি করে সন্ধানীর দিকে চেয়ে রইলেন। নিজের চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে কামরুজ্জামান সন্ধানীকে বললেন, "বসের অনুমতি ছাড়া আমি আসলে কোনো কাজই করি না।"

অনুমতি পেয়ে সন্ধানীও স্যারের উলটো দিকের চেয়ারটা টেনে বসল। দুজনের মাঝে ডেস্কের ডান-দিকে-বসা ফারজানা ম্যাম, একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। সন্ধানী তার কাগজপত্রগুলো ডেস্কের উপর রাখল। কামরুজ্জামান চেয়ারের ডান দিকের হাতলে হেলান দিয়ে মুখ থেকে ভেইপের এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "নিকোটিন ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। তাই এই ভেইপ।"

"এই শুরু হলো খেজুরে আলাপ!" ভাবলেন ফারজানা।

"ওহ আচ্ছা। অনেক ভালো উদ্যোগ, স্যার। গুডলাক।" সন্ধানী বলল।

"শুনলাম স্মোকিং ছেড়ে দেওয়া নাকি খুব সহজ। অনেকেই কয়েক শত বার স্মোকিং ছেড়েছে।"

সন্ধানী শব্দ করে হাসল।

"স্টুডেন্টগুলা পারেও টিচারের চাহিদা অনুযায়ী তেল মারতে।" ভাবলেন ফারজানা, "একই কৌতুক কোনো বন্ধুর কাছে শুনলে মুখ বাঁকিয়ে বলত 'পুরানা জোক'।"

সন্ধানীর সময় বাঁচানোর কথা ভেবে অগোছালো ডেস্ক থেকে কলম, সিল আর স্ট্যাম্পপ্যাড খুঁজে বের করে ফেললেন তিনি। এগিয়ে দিলেন কামরুজ্জামানের দিকে। ফর্মাল হাসি দিয়ে কামরুজ্জামান বললেন, "থ্যাংকিউ, ম্যাম।" স্বামী-স্ত্রীর রসায়ন দেখে মুচকি হাসতে হাসতে সন্ধানীও কাগজপত্র আর ছবিগুলো এগিয়ে দিল।

সার্টিফিকেটের ফটোকপিগুলোতে সাইন করতে করতে কামরুজ্জামান বললেন, "সন্ধানী সেন, তোমাদের আজাদ সংঘের কোনো সাড়াশব্দ পাই না যে এখন?"

সন্ধানীকে একটু যেন ক্লান্ত দেখাল। বলল, "স্যার, আমি তো বেশিদিন সংগঠনটায় থাকি নাই। ফার্স্ট ইয়ারের পর থেকে আর তেমন যাতায়াত নেই।"

স্যার একটু মিটিমিটি হেসে বললেন, "ব্লগার-হত্যা শুরু হওয়ার পর ভয়ে ছেড়ে দিয়েছ নাকি?"

ফারজানা ম্যাম একবার স্বামীর মুখের দিকে আরেকবার সন্ধানীর দিকে তাকিয়ে কথোপকথন শুনছেন।

"ঠিক ওইজন্য না।" সন্ধানী জবাব দিল, "আমি আসলে ওদের আইডিওলজিতে বিশ্বাসী না।"

"এখন কি কমপ্লিটলি রিলিজাস লাইফ লিড করছ নাকি?"

ফারজানা মুখ দিয়ে বিরক্তির শব্দ করে বললেন, "আহহা!"

সন্ধানী দ্রুত বলল, "নো প্রবলেম, ম্যাম। ইট'স ওকে। স্যার, আমি নিজেকে ঠিক ধার্মিক বলব না, তবে আস্তিক। হয়তো একসময় কোনো একটা ধর্মে বিশ্বাসী হতেও পারি।"

সিগনেচার করে কামরুজ্জামান বললেন, "তুমি তো খড়ের গাদায় সুঁই খুঁজছ। ইন্টারনেটে ঢুকলে দেখি একেকটা ধর্ম নিয়েই লাখ লাখ প্রশ্ন। সবগুলোর উত্তর তুমি জানতে পারবে কখনও?"

সন্ধানী বলল, "এখানে স্যার, আমার একটা হাইপোথিসিস আছে। একটা গান শোনার পর চিন্তাটা মাথায় এসেছে।"

"তাই? আমাকে লিংকটা মেইল করে দিয়ো তো।" কাগজপত্র থেকে মুখ না তুলে বললেন কামরুজ্জামান, "ধর্মীয় তর্কে অত আগ্রহ পাই না। তবে গানবাজনা খুবই ভালো লাগে।"

কাগজে সিল মারা শেষ করতেই কামরুজ্জামানের ফোন 'বিপ' করে উঠল। "হোক কলরব—অর্ণব।" ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে পড়লেন তিনি, "আচ্ছা। সিঙ্গারের নাম কী?"

“ওকে, স্যার।”

সন্ধানী বিস্ময়মাখা হাসি দিয়ে ফারজানা ম্যামের দিকে তাকাল। ফারজানা বিব্রত হাসি দিয়ে বললেন, “অর্ণব অবশ্যই! কী আশ্চর্য কথা!”

কামরুজ্জামান বললেন, “ওহ সরি..... ছোটোকালেও একবার এমন হয়েছিল।” চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার ভেইপ মুখে দিলেন কামরুজ্জামান, “একটা বইয়ের শুরুতে কয়েক লাইন কবিতা পড়লাম। বড়ো হয়ে জেনেছি শেষের লাইনটা কবির নাম ছিল।” তারপর চোখ বন্ধ করে ভরাট কণ্ঠে বলতে লাগলেন,

“সুরঞ্জনা, তোমার হৃদয় আজ ঘাস :
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।
জীবনানন্দ দাশ।”

আবৃত্তি শুনে ওই মেয়েটা আরও কিছু তৈলাক্ত প্রশংসা করেছিল বলে মনে পড়ে ফারজানার।

এখন এই গভীর রাতেও ওই মেয়ের দেওয়া গানটাই ফারজানার কানে বাজছে।

হোক কলরব, ফুলগুলো সব লাল না হয়ে নীল হলো ক্যান?
অসম্ভবে কখন কবে মেঘের সাথে মিল হলো ক্যান?
হোক অযথা, এসব কথা তাল না হয়ে তিল হলো ক্যান?
কুয়োর তলে, ভীষণ জলে খাল না হয়ে ঝিল হলো ক্যান?
দুত্তুরি ছাই, মাছগুলো তাই ফুল না হয়ে চিল হলো ক্যান?
হোক কলরব, ফুলগুলো সব লাল না হয়ে নীল হলো ক্যান?

লাল না হয়ে নীল। খাল না হয়ে ঝিল। তাল না হয়ে তিল।

কিছু ভাবনা মাথায় আসছে, কিন্তু গানের কথাগুলোর মতোই বিক্ষিপ্ত। কাল মেয়েটাকে ডাকিয়ে এনে দুজন একসাথে আলোচনা করলে হয়তো কিছু যোগসূত্র মিলবে। ভাবতে ভাবতে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন ফারজানা। আর স্বপ্নে দেখতে লাগলেন কুয়োর তলায় সুন্দর একটা ঝিল। পানি থেকে মাথা বের করে নীল রঙের কিছু ফুল থেকে পাঁপড়ি ছিঁড়ে খাচ্ছে কতগুলো মাছ। দেখতে না-দেখতেই মাছগুলো আবার চিল হয়ে আকাশে ডানা মেলে উড়তে উড়তে ঢুকে গেল মেঘের ভেতর!

“মে আই কাম ইন ম্যাম?”

মুখ তুলে তাকালেন ফারজানা। হাসি দিয়ে বললেন, “এসো সন্ধানী। বসো.... ক্লাস আছে এখন?”

“না, ম্যাম।” সন্ধানী বসতে বসতে বলল, “পরের দুইটা স্লট খালি।”

“ওহ। ভালোই হলো। চলো কালকের ওই গানটা ডিসকাস করি।”

“জি ম্যাম, শিওর। স্যার কিছু ডিকোড করে বের করেননি?”

“তোমার স্যারের কি ওইসবের কোনো খেয়াল আছে? এই টপিক নিয়ে যে তোমার সাথে দু-লাইন কথা বলেছে, ওটাই বোধ হয় বিকেল হতে হতে ভুলে গেছে।”

সন্ধানী হেসে বলল, “ও আচ্ছা। ম্যাম, আপনি কী ভাবলেন গানটা নিয়ে?”

ফারজানা একটু ভেবে বললেন, “উমম.... গানটা অনেকগুলো প্রশ্নের সমষ্টি। কিছু প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয়, কিছু একেবারেই অর্থহীন।”

“এক্সাক্টলি, ম্যাম।” বলল সন্ধানী, “এটাই বলতে চাচ্ছি। ফুল যদি সত্যিই নীল না হয়ে লাল হতো, তখন তো আবার প্রশ্ন উঠত সবুজ বা হলুদ না হয়ে লাল হলো কেন। মাছগুলো চিল হয়ে গেলে প্রশ্ন উঠত বক হলো না কেন...”

“হুম হুম।”

“লেট মি গেস। ধর্ম নিয়ে করা প্রশ্নগুলোকে তুমি এরকমই মনে করো, তাই না?”

“জি, ম্যাম। ওটাই। Anti-religious ব্লকের প্রশ্নগুলো একসময় আমার কাছে ওইরকমই মনে হতে শুরু করে। এই ধর্মের ওই বিধানটা বিজ্ঞানের সেই থিওরির সাথে মেলে না কেন, ওই সামাজিক নিয়মটা বর্তমানের সেই সামাজিক নিয়মের মতো না কেন... এভাবে আর কত প্রশ্ন করবে? এটা আসলে সত্যের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম না।”

“এটা বাইপাস রোড হতে পারে, মেইন রোড না; রাইট?”

“জি ম্যাম, বিজ্ঞানের থিওরি বলেন আর সমাজের গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি বলেন—সময়ের সাথে সাথে সবই চেইঞ্জ হচ্ছে। আজকে আমার কাছে পলিগ্যামি ভালো লাগে না, ১৮ বছরের নিচে বিয়ে করার রীতি ভালো লাগে না, তার মানে এই না যে আমার ভালো লাগা না-লাগাটাই একেবারে ধ্রুব সত্য। আর এসব বিধিবিধান কোনো ধর্মের *core philosophy* না। আমাদের এই ফিলোসফি নিয়েই আসলে বেশি সময় দেওয়া উচিত।”

“সেটা কীরকম?”

“আমার কাছে মনে হয়েছে তিনটা ফান্ডামেন্টাল বিষয়ের উত্তর জানাটাই আসল। একটা হলো স্রষ্টা... আমার প্রথম জানা দরকার—স্রষ্টা কি এক, না অন-এক। সেই সাথে তাঁর বা তাঁদের সত্তা আর গুণাবলি।”

ফারজানা বললেন, “কিন্তু ফিলোসফাররা তো মনে করে স্রষ্টা কেবল প্রাইম মুভার।”

“জি, জি।” জোরে জোরে মাথা নাড়ল সন্ধানী।

“দার্শনিকদের ধারণা, স্রষ্টা কেবল প্রথম ধাক্কাটা দিয়ে কজ অ্যান্ড ইফেক্টের একটা চেইন চালু করে দিয়েছেন। বাকি সব বিষয়ে তিনি নির্বিকার।”

“এক্সাক্টলি ম্যাম। কিন্তু ধার্মিকদের স্রষ্টা এমন নন। তিনি ভালোর পক্ষে, মন্দের বিপক্ষে। যে ভালো কাজ করে, তাকে সাহায্য করার জন্য এই স্রষ্টা অলওয়েজ রেডি। আমাকে চিন্তাভাবনা করে বের করতে হবে এই ধারণাগুলোর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশি সেন্স মেইক করে।”

“মানে স্রষ্টার ব্যাপারে সার্বিক একটা জ্ঞান। ঠিক ধরেছি?”

“ইয়েস, ম্যাম। এই গেল একটা বিষয়। দ্বিতীয়টা হচ্ছে স্রষ্টা যদি ভালো-খারাপের ব্যাপারে কনসার্নড হন, তা হলে তিনি বা তাঁরা আমাদের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করেন। ভালো-খারাপটা তিনি আমাদের কীভাবে জানান। সেটা কি স্রষ্টার দেওয়া বুদ্ধি ব্যবহার করে আমরা নিজেরা ভেবে বের করব, নাকি তিনি বা তাঁরা নিজে এসে বা অবতার, সন্তান, দেবদূত, নবি, রসুল কিছু একটা পাঠিয়ে জানিয়ে দেবেন?”

“Deism, Prophethood আর Avatarism… এই তো?”

“ঠিক তা-ই। থার্ডলি, ভালো-খারাপ কাজ করার বিনিময়ে তিনি আমাদের কী দেবেন, কীভাবে দেবেন, আদৌ দেবেন কি না।”

“তার মানে মেটাফিজিক্সে যেতেই হচ্ছে। ল্যাবরেটরিতে হাইড্রোজেন-অক্সিজেন বিক্রিয়া করিয়ে জগতের সব রহস্য সমাধান হবে না।”

“রাইট।”

কিছুক্ষণ নীরবে ভাবলেন ফারজানা। তারপর বললেন, “ধর্মীয় বিধি-বিধানগুলো তো এসব ফিলোসফিরই এক্সপ্রেশান। ফিলোসফি যদি রুট হয়, বিধি-বিধানগুলোকে বলা যায় কাণ্ড, শাখা, পাতা। সব সময় কি মূল ধরেই ডালপালায় আসতে হবে? ডালপালা দেখেই তো কিছু কিছু মূলকে বাদ দিয়ে দেওয়া যায়।”

সন্ধানী চুপ থেকে প্রশ্নটা একটু বোঝার চেষ্টা করল। ফারজানা বললেন, “আচ্ছা, উদাহরণ দিই। আচেবের *Things Fall Apart* তো পড়ালাম তোমাদের। যমজ সন্তান হলে ওরা কী করত, মনে আছে?”

“ম্যাম, অশুভ মনে করে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসত।”

“রাইট। এটা কি জাস্ট সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, না নিষ্ঠুরতা?”

“নিষ্ঠুরতা।” কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল সন্ধানী।

“ধরে নিলাম এটা ওদের সামাজিক কুসংস্কার। ধর্মীয় না। সতীদাহের কথা ধরো। এটা কি তোমাদের…. আই মিন সনাতন ধর্মের কোনো বিধান, নাকি সামাজিক কুসংস্কার—এ নিয়ে আমি না জেনে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। কিন্তু কথার কথা, ধরো কোনো ধর্মে সত্যিই এরকম বিধান আছে। যমজ বাচ্চাকে মেরে ফেলা, স্বামীর সাথে স্ত্রীকে পোড়ানো ইত্যাদি। তখন কি তোমার মাটি খুঁড়ে আন্ডারলাইং ফিলোসফি বের করে দেখতে হবে? নাকি ডালপালা দেখেই বুঝবে মূলে কোনো সমস্যা আছে?”

সন্ধানী অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, “ম্যাম, আমার মনে হয় পৃথিবীর মেজর কোনো ধর্মে এরকম আজগুবি বিধান নেই। যেগুলো আছে, তার সবই ধর্মের নামে মানুষের চালিয়ে দেওয়া জিনিস... আচ্ছা, তারপরও বিষয়টার নিয়ে আরেকটু ভাবতে হবে, ম্যাম।”

“শিওর। টেইক ইওর টাইম।”

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ম্যাম বললেন, “ঠিক আছে, সন্ধানী। আলাপ করে ভালো লাগল। অন্য কোনো দিন সময় পেলে আরও আলাপ হবে।”

“এখন চলে যাও” কথাটাই ভদ্র-সমাজে এভাবেই বলা হয়, তাই আদাব বলে বেরিয়ে এল সন্ধানী।

ফারজানা আনমনে ভাবতে লাগলেন, ছোটোবেলায় ইসলাম শিক্ষা বইয়ে তৌহিদ, রিসালাত, আখিরাত এরকম কিছু বিষয় পড়েছিলেন। সন্ধানীর আলাপের সাথে অনেক মিল দেখা যাচ্ছে। ওগুলোও ধর্মের কোর ফিলোসফি টাইপের কিছু। সন্ধানীকে আবার ডাকিয়ে এগুলো নিয়ে আলাপ করা কি ঠিক হবে? নাহ, থাক। তখন সে ভাববে ফারজানা তাকে নিজের ধর্মে টেনে আনতে জোরাজুরি করছেন।

প্রতিমা বিসর্জন

সুব্রত সেন পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করছিলেন অটোরিকশার ভাড়া দেওয়ার জন্য। কল্যাণী তাঁর হাতে একরকম ধাক্কা দিয়ে বললেন, “অ্যায়, তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি!” মানিব্যাগ প্রায় পড়েই যাচ্ছিল সুব্রত বাবুর হাত থেকে। বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে বললেন, “আহহা, এত লাফাচ্ছ কেন!”

সন্ধানী তার মায়ের কাঁধে হাত রেখে বলল, “পুজো তো আর তোমাকে ফেলে চলে যাচ্ছে না। শান্ত হও, মা।” কল্যাণী দেবীর শিশুসুলভ আনন্দমাখা চেহারা যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

“নাও, এটা পুজোর বোনাস।” কিছু টাকা বেশি দিয়ে অটোওয়ালাকে বিদেয় করলেন সুব্রত বাবু।

দশমীর দিনে মেসো-মাসির বাড়িতে পরিবার-সমেত ঘুরতে এসেছে সন্ধানী। আত্মীয়দের মাঝে এদের বাসায়ই খুব ঘটা করে পুজো হয় প্রতিবছর। গেটে পা রাখামাত্রই আত্মীয়রা এসে তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল। চোখ ধাঁধানো মণ্ডপে চলছে দশমীবিহিত পূজা।

সন্ধানীর সমবয়সী হওয়ায় মাসতুতো বোন জয়িতার সাথে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা। এসেই সন্ধানীর হাত ধরে টানতে টানতে বলল, “এই যে নাস্তিক সন্ধানী, চল চল। আজ আমাদের সাথে অঞ্জলি দিতে হবে তোকে।”

“চুপ থাক! আমি মোটেও নাস্তিক না।” কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে জবাব দিল সন্ধানী। বয়স্কা কিছু আন্টির চোখে “এ কী কলিকাল!” ভাব ফুটে উঠল। কল্যাণীর কানে কানে একজন বললেন, “দিদি, এসব কী বলে? সোনু কি আসলেই নাস্তিক?”

“আরে না না!” দ্রুত হাত নাড়লেন কল্যাণী, “বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুষ্টামি করে বলে আরকি। নাস্তিক হলে উপবাস থাকবে কেন, শুনি?”

আন্টিরা তখনই পুরোপুরি আশ্বস্ত না হলেও পরে সন্ধানীকে অঞ্জলি দিতে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ কারও সাথে ধাক্কা লাগল সন্ধানীর। পেছন ফিরে আচমকা থমকে গেল। তারপর তিক্ত হাসি দিয়ে বলল, “Such an unpleasant surprise!”

দু-হাত জোড় করে প্রায় কপাল পর্যন্ত তুলল ইন্দ্র, “নমস্কার, দিদি। ভাইকে আশীর্বাদ করবে না?”

নমস্কারের জবাব দিতে দিতেই ইন্দ্রের ফেসবুক স্ট্যাটাসটা ঘুরতে লাগল সন্ধানীর মনে :

“মা! মা গো! গার্লফ্রেন্ডটা এবারের পুজোতেই জুটিয়ে দিয়ো মা! আবার এক বছর পর মর্ত্যে আসবে। ততদিন জ্বালা সইতে পারব না।”

কমেন্ট সেকশনে সবার সে কী খুনশুটি আর প্রশ্রয়। ধুম ধাড়াক্কা ফেমিনিস্ট বান্ধবীগুলোও বাদ যায়নি সেদিন।

ইন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়াল ফয়সাল। সবুজ সরণিতে দ্যুতি আপুর সাথে ঘটনাটার পরও এখনও নির্লজ্জের মতো সবখানে চেহারা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। ইন্দ্রের ফেসবুক ফ্রেন্ড হওয়ার সুবাদে এখানেও হাজির হয়েছে।

ফয়সালও যখন বিদ্রুপের হাসি দিয়ে নমস্কার দেখাল, সন্ধানীর তখন একটু বিরক্তই লাগল। মনে মনে ভাবল, “আর মানুষ কিনা আমাকে মনে করে নাস্তিক!”

মুখে বলল, “তা তুই কী মনে করে, ফয়সাল? খাওয়াদাওয়ার জন্য না সিঁদুর খেলা দেখার জন্য?”

“বলে কী!” বলল ফয়সাল, “সম্প্রীতি বলে কি কিছু নাই? বিশ্বাস করি না বলে কি দেখে মজাও নিতে পারব না.... আই মিন, করতে পারব না? কী বলিস ইন্দ্র?” কাঁধ দিয়ে ইন্দ্রকে একটা ধাক্কা মারল সে।

হঠাৎ তাদের পেছন থেকে দুজনের কাঁধে দুই হাত রেখে আবির্ভূত হলো জয়িতা, “অ্যাই কী নিয়ে কথা বলতেছিস? শোন, এইখানে আবার ঝগড়াটগড়া লাগাইস না। চুপচাপ বসে বসে পুজো দ্যাখ। বুঝলি?”

“আরে ধুর! বাচ্চা নাকি আমরা?” ফয়সাল বলল, “ঝগড়া লাগাব ক্যান?”

“আরে বাদ দে!” ইন্দ্র বলল, “জয়ী চল, জয়ী চল, দুর্গা মায়ের সাথে কয়েকটা সেলফি তুলি।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, চল চল,” খুব আগ্রহ নিয়ে বলল জয়িতা। “পায়েল, নিতু, তন্বী ওরাও আছে।” একটু দূরে গিয়ে বলল, “নাস্তিক সন্ধানীকে বলে দেখ, আসবে কি না।”

ফয়সাল ইচ্ছে করে গলা চড়িয়ে বলল, “অ্যাই নাস্তিক সন্ধানী! আসবি নাকি আমাদের সাথে?”

সৌভাগ্যক্রমে কোলাহল আর বাদ্যের আওয়াজে কেউ তেমন শুনল না।

মা-বাবা তাঁদের বন্ধু-আত্মীয়দের নিয়ে মেতে আছে। সাধন পেয়ে গেছে সমবয়সী কাজিনদের। সন্ধানী অনেকটা একঘেয়ে ভাব নিয়েই বসে বসে দর্পণ-বিসর্জন দেখতে লাগল। জয়িতা দূর থেকে দেখে বুঝল সন্ধানী খুব একটা এনজয় করছে না। কাছে এসে বলল, "উপরে যাবি? চল রুমে বসে আড্ডাটাড্ডা দিই।" প্রস্তাবটা সানন্দে লুফে নিল সে।

বড়োদেরকে বলে মণ্ডপ ছেড়ে উপরতলায় চলে গেল দুজন। "তুই আমার রুমে গিয়ে বস, আমি আসতেছি।" বলে কোথায় জানি গেল জয়িতা। কম্পিউটারে বুঁদ হয়ে গেমস খেলতে থাকা জয়ন্তর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল সন্ধানী। জয়ন্ত, জয়িতার ছোটো ভাই, এ বছর পি.এস.সি দেবে।

তার মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, "কীরে? পুজোয় না গিয়ে বসে বসে কী গেমস খেলতেছিস?"

"হাই, দিদি!" পেছনে না তাকিয়েই বলল জয়ন্ত, "এখন বিরক্ত কোরো না। *ব্যাটল অব গডস* খেলছি।"

"ব্যাটল অব গডস?"

"হ্যাঁ। যে-কোনো একটা গড বা ডেমি-গডের ক্যারেক্টার নিয়ে অন্য গডদের সাথে মারপিট করতে হয়।"

"ওহ! তা তুই কোন ক্যারেক্টার নিছিস? মূষিক? না লক্ষ্মীপ্যাঁচা?"

"কী যে বলো না দিদি! এখানে ওসব দেবতাটেবতা নেই, সব রোমান গড। আমি নিছি শক্তির দেবতা—পোটেসটাসকে।"

"এরকম অন্ধকার অন্ধকার কেন? গ্রাফিক্স বাজে নাকি?"

"নাহ। দুই লেভেল আগে সূর্যদেব সোল-কে খুন করেছি তো। তাই সূর্য ধ্বংস হয়ে গেসে। হি হি হা হা হা!"

"কী সর্বনাশ!"

"সর্বনাশের দেখসো কী, দিদি? পৃথিবীর দেবী টেরাও শেষ। এখন সময়ের দেবতা স্যাটার্ন চলতেছে।"

সন্ধানী মনিটরে দেখল বিশাল এক দৈত্যের শরীরে দৌড়ে দৌড়ে তাকে অস্ত্র দিয়ে খোঁচাচ্ছে পোটেস্টাস। আর বিশাল হাত দিয়ে তাকে পিষে ফেলার চেষ্টা করছে স্যাটার্ন। রক্তারক্তির দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে না পেরে একটু সরে এল সন্ধানী। তারপর বলল, "আচ্ছা জয়ন্ত! পৃথিবীর দেবী মরে গেলে তুই এখন কোথায় দাঁড়ায়া আছিস? আর সময় ধ্বংস হয়ে গেলে সবকিছু টিকবে কীভাবে?"

"যাও তো দিদি! অতকিছু ভাবলে গেম খেলব ক্যামনে।"

এমন সময় জয়িতা চলে আসায় সন্ধানী-সহ তার রুমে গেল। দুজন খাটের উপর বসে গল্প জুড়ে দিল। কথায় কথায় জয়িতা বলল, "আচ্ছা সন্ধানী, ভার্সিটি লাইফে তো দুইবার চেইঞ্জ হইলি। এখন কোন ধর্ম ফলো করছিস?"

"আমার পরিবর্তন আসলে প্রতিদিন হইতেছে রে, জয়ী। এমন না যে কেবল হিন্দু থেকে নাস্তিক হইলাম, এরপর নাস্তিক থেকে আবার *deist*। সারাক্ষণই অনেককিছু মাথায় ঘোরে। এখন যেমন বহু-ঈশ্বরের ধারণাটা নিয়ে ভাবনা চলতেছে।"

"তাই? যেমন?"

সন্ধানী কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, "এই যে দ্যাখ, মানুষ। মানুষ মানুষের সাথে যুদ্ধ করে, ঝগড়া করে। গড যদি একাধিক হয়, তা হলে কি একটা ব্যাটল অব গডস লেগে গিয়ে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা না?"

"উমম..... হয়তো। হইতে পারে দেব-দেবীদের নিজেদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো। হয়তো যার যার কাজের ক্ষেত্র আলাদা। এরকম ঝগড়াঝাঁটি কখনও হবে না।"

"কাজ আলাদা, এইটা আমার বিশ্বাসই হয় না। একসময় ভাবা হইতো আকাশ-বাতাস-মাটি-পানি সব আলাদা। আজকে সেগুলার মাঝে ইন্টারঅ্যাকশন বুঝতে তো খুব বেশি বিজ্ঞান জানতে হয় না, রাইট? মানে বনের দেবতা আর মেঘের দেবতা যদি আলাদা হয়.... অথবা দেবী.... তা হলে কার কাজের ক্ষেত্র আসলে কতটুকু? গাছপালার প্রভাবে বৃষ্টি হয়। তা হলে বনের দেবতা কি মেঘের দেবতার কাজে ভাগ বসালেন না?"

এমন সময় "উহহহহহহ" করে গমগমে যান্ত্রিক কণ্ঠে একটা চিৎকার এল কোত্থেকে যেন। জয়ন্ত হয়তো আরেকটা দেবতাকে মেরে ফেলেছে।

জয়িতা বলল, "চিন্তার বিষয়। আমাদের ধর্মে আসলেই এমন কোনো আইডিয়া কি আছে নাকি—যে একজন বনের দেবতা, একজন মেঘের?"

"আচ্ছা দুর্গা প্রতিমার আশপাশের দেবতাদেরই ধর।" বলল সন্ধানী, "আমি সুন্দর হতে চাইলে সেটা কার কাছে চাইব? কার্তিকেয়'র কাছে? না লক্ষ্মীর কাছে? আমি কার্তিকেয়'র কাছে পুরুষালি সৌন্দর্য চাই না, কিন্তু লক্ষ্মী আবার সৌন্দর্যের দেবী না। আবার ধর, আমি ধনী হইতে চাই। পড়াশোনা না কইরা লক্ষ্মী দেবীর আশীর্বাদে যদি আমি ধনী হই, তা হলে হয় দেবী অলৌকিকভাবে আমাকে সম্পদ দিছেন আর নয়তো আমি দুর্নীতিবাজ। প্রথমটা ঈশ্বরের সাধারণ কর্মপদ্ধতি না। তিনি মাধ্যম ব্যবহার করেই ভক্তদের মনের আশা পূরণ করেন.... বেশিরভাগ সময়.... আমি মিরাকেলকে অবশ্য অস্বীকার করতেছি না। আর দ্বিতীয়টা হওয়া পসিবলই না। তা হলে ধনী হতে হলে আগে বিদ্যা অর্জন করে তার যোগ্য হতে হবে। হোক তা কৃষিশিক্ষা বা ইঞ্জিনিয়ারিং। কিন্তু বিদ্যার দেবী আবার আরেকজন। তাইলে কি আমি বিদ্যা অর্জনের জন্য একজনের কাছে প্রার্থনা করব, আর তার ফলাফলের জন্য আরেকজনের কাছে?"

এমন সময় আবারও গমগমে কণ্ঠ শুনে চমকে কান চেপে ধরল দুজনই, “You challenge me, Potestas! The god of the seas!” আরেকটা কণ্ঠ বলল, “A true god doesn't hide himself under water, Neptune! Show yourself.” ভুস করে পানি থেকে কিছু ওঠার আওয়াজ হলো। প্রথম কণ্ঠটা বলল, “You have disrespected a god for the last time, demi-god. Your death is close at hand.”

“উফ! জয়ন্ত, সাউন্ডটা কমা।” চেঁচিয়ে বলল জয়িতা। পাশের রুম থেকে আওয়াজটা একটু কমে এল।

সন্ধানীর দিকে ফিরে জয়িতা বলল, “আচ্ছা মানলাম। কিন্তু সব দেব-দেবী তো আসলে একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ। একেকটা রূপ এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন শক্তির প্রতীক।”

“বিষয়টা কেমন না? তা হলে কি রাম বা বিষ্ণু নিজেই নিজেকে পূজা করে নিজেরই অকালবোধন করসেন? নিজেই তারপর দেবী দুর্গা হয়ে আবির্ভূতা হইসেন? অথবা স্বর্গ থেকে দেবতারা বিতাড়িত হয়ে নিজেদের কাছেই নিজেদের দুঃখের কথা বলসেন? তারপর নিজেরাই শম্ভু-বিষ্ণু সেজে তা শুনসেন? তারপর নিজেদের তেজ থেকে নিজেদেরকেই দুর্গা নামে তৈরি করসেন? আবার নিজেই গিয়া সেই মহিষাসুরকে পরাজিত করসেন, যেই মহিষাসুরের দাপটে নিজেরাই স্বর্গ থেকে বের হয়ে গেসিলেন? আর একই লজিক অনুযায়ী, স্রষ্টা-সৃষ্টি একই সত্তা হওয়াটা আরও বড়ো অবিচার। এর অর্থ দাঁড়ায় পরমাত্মা নিজেই রেপিস্ট হয়ে নিজেকেই রেপ করে, নিজেই বাস চালায়, আবার নিজেই মানববন্ধন করে নিজের ফাঁসি চায়।”

“এই দাঁড়া, দাঁড়া। এতক্ষণ তোকে একেশ্বরবাদী ভাবতেছিলাম। কিন্তু তোর শেষের কথাগুলা তো একেশ্বরবাদকেও ধ্বংস করে দিতেসে। সেই তো নাস্তিকদের মতোই কথা বলতেছিস।”

“উহুঁ, বলতেছি না। এখন পর্যন্ত আমার কনক্লুশন হচ্ছে স্রষ্টা আর সৃষ্টি আলাদা সত্তা। নিরাকার স্রষ্টা আসলে এক অজানা আকার। ইনফ্যাক্ট, আকারের কনসেপ্টের স্রষ্টাও তিনি নিজেই। তা হলে তিনি এমন এক সত্তা, যাকে আমরা মানবীয় কোনো বৈশিষ্ট্য দিয়ে বুঝতে পারব না।”

“ওকে। নো প্রবলেম। সেই সত্তা চাইলেই কি মহাষষ্ঠীতে নিজের সত্তাকে দুর্গা প্রতিমায় স্থাপন করতে পারেন না? তারপর দশমীতে দর্পণ বিসর্জনের মাধ্যমে ত্যাগ করতে পারেন না? তা হলেই তো তোর একেশ্বরবাদের আইডিয়ার সাথে পূজার কোনো ঠোকাঠুকি থাকতেছে না।”

“হয়তো। কিন্তু একেশ্বরবাদীরা এরকম *fetish*-এ বিশ্বাস করে না। তুই একটা মসজিদ ভাঙলে মুসলমানরা কিন্তু বলবে না যে আল্লা ভেঙে গেসে। কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর আর দর্পণ বিসর্জনের আগে কেউ যদি দুর্গার প্রতিমা ভেঙে ফেলে, তা হলে কিন্তু বলতে হয় যে দেবী ভেঙে গেলেন। কারণ সে সময় প্রতিমা একটা ফেটিশ, দেবীর নিজস্ব সত্তা সেখানে আছে। অন্তত ফেটিশ থাকাকালীন সময় দুর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী-গণেশ-কার্তিকেয় সবাই মিলে একটা মাছিও কেন সৃষ্টি করেন না? অথবা মাছি কিছু নিয়ে গেলে তারা কেন ঠেকাতে পারেন না?”

জয়িতাকে একটু চিন্তিত দেখাল। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, “আচ্ছাহ, খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। চল নিচে যাই।”

"হ্যাঁ, শিওর।"

জয়ন্ত তখনও কম্পিউটারের সামনে বসা। জয়িতা যেতে যেতে ডাক দিল, "অ্যাই জয়ন্ত, এইটা অফ কর। আয়, খেতে আয়।"

পেছন পেছন যেতে যেতে সন্ধানী একটু থমকে দাঁড়িয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকাল। পরাজিত নেপচুন একটা পাথরে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছে। নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে পোটেস্টাস। নেপচুন বলল, "No matter how many gods fall, there will always be another one to stand against you."

"They will fall as well," পোটেস্টাসের ত্বরিত জবাব।

নেপচুন আবারও বলল, "You will never be able to kill all of them."

পোটেস্টাস বলল, "Then prepare for your death, Neptune."

তারপর পাশবিকভাবে তাকে মারতে লাগল পোটেস্টাস। কৃত্রিম রক্তের ছিটা এসে স্ক্রিনটাকে লাল করে দিচ্ছে। সন্ধানীর কান ফাটিয়ে দিচ্ছে ঢাকের শব্দ। কোমর দুলিয়ে নাচার মতো ঢাক নয়, কেমন অশুভ অনুভূতি তৈরি করা শব্দ। সেই অনুভূতি বাড়িয়ে দিচ্ছে মন্দিরার টুংটাং আওয়াজ আর সম্মিলিত নারীকণ্ঠের উলুধ্বনি। চশমা পরেও কেমন জানি ঝাপসা দেখছে সন্ধানী।

নেপচুনকে টেনে হিঁচড়ে পাহাড়ের কিনারে নিয়ে এল পোটেস্টাস। ছিটকে নিচে ফেলে দিল সেখান থেকে। যেন অনন্তকাল যাবৎ পড়তে পড়তে ছপাস করে সাগরে পড়ল নেপচুনের মৃতদেহ। ঠিক যেন আরেকটা প্রতিমা বিসর্জন। সেইসাথে ঢাক, মন্দিরা আর উলুধ্বনির শব্দ থেমে গিয়ে কেমন নীরব হয়ে গেল চারদিক।

"অ্যাই সন্ধানী! তুইও গেমস খেলতে বসলি নাকি?" জয়িতার চিৎকারে সংবিৎ ফিরে পেয়ে আবার হাঁটা দিল সন্ধানী।

নয় ছয়

কাপড় মেলতে মেলতে মেয়ের দিকে তাকালেন কল্যাণী দেবী। প্রতিদিন সকালেই ছাদে বসে বেশ কিছুক্ষণ মেডিটেশন করে সন্ধানী। ভালোই লাগে কল্যাণী দেবীর কাছে। ঠাকুরের মূর্তির সামনে যদিও বসে না সে। তারপরও এই যুগে ধর্মকর্ম করাটাই বা কম কীসে? ভার্সিটির ছেলেমেয়েগুলোর আজকাল যা অবস্থা! সে তুলনায় ঈশ্বর কত ভালো রেখেছেন তাঁর মেয়েটাকে। কল্যাণী টেবিলে নাস্তা আনতে আনতেই ছাদ থেকে নেমে এল সন্ধানী।

"হ্যাঁ রে, সোনু! ধ্যান করা শেষ হলো?" খুনশুটির মতো বললেন কল্যাণী। জবাবে কিছু না বলে শুধু হাসি দিল সন্ধানী। চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করে কল্যাণীর রান্না করা সবজির ঘ্রাণ নিল। তারপর বলল, "মা! এরপর থেকে সবজিটাও আমি রান্না করি?"

সন্ধানীর বানানো রুটিগুলো থেকে কয়েকটা তার সামনে প্লেটে রাখতে রাখতে কল্যাণী বললেন, “করিস। কদিন পর স্বামীর সংসারে যাবি। শুধু রুটি বেললে হবে? তরকারি রান্নাতেও হাতটা পাকিয়ে নে এখন থেকে।”

“উফফ, মা...!”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। পড়াশোনা শেষ করবি, চাকরিবাকরি করবি, নিজের পায়ে দাঁড়াবি, তারপর বিয়ে, তাই তো? ওটাই বললাম। তখন তো স্বামীর সংসারে যাবিই। নাকি?”

“মনে থাকে যেন, হ্যাঁ!”

“তা সোনু, একটা কথা বল দেখি। তুই ধ্যান করার সময় কোন অবতারের কথা ভাবিস?”

“কোন অবতারের কথা ভাবব? আমি তো প্রতিমার সামনে বসি না।”

“আহা, সেজন্যই তো বলছি। সন্ন্যাসীদের মতো করে নিরাকার ব্রহ্মার পুজোয় মন লাগাতে পারিস তুই?”

“একটু একটু চেষ্টা করি।”

“নাকি সূর্যদেবের আরাধনা করিস?”

চুপ করে নাস্তা করতে লাগল সন্ধানী। কল্যাণী সাহস দেওয়ার স্বরে বললেন, “আরে আমাকে বলতে সমস্যা কী রে? ভগবান তাঁর সৃষ্টির সবকিছুতে ছড়িয়ে আছেন।”

সন্ধানী হালকা অবাক হওয়ার মতো বলল, “তাই? নক্ষত্রের মধ্যে আছেন?”

“হুমম, আছেন।”

“চাঁদের মধ্যে?”

“অবশ্যই।”

“নাকি সূর্যের মধ্যে? ওটা আরও বড়ো।”

কল্যাণী হেসে দিয়ে বললেন, “হ্যাঁ রে পাগলি, হ্যাঁ!”

সন্ধানী আরও কিছুক্ষণ চুপ থেকে মুখ খুলল, “যা অস্ত যায়, তাকে আমার পছন্দ নয়, মা।”

“ওও বাবা! মেয়ে তো আমার সত্যিই ঋষিদের মতো কথা বলে আজ! যাক গে। তুই তোর মতো কর, আমার সমস্যা নেই। খালি যেন নাস্তিকদের মতো হয়ে যাস নে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দি মাড়াইনি বটে। কিন্তু ওখানকার মানুষগুলো যে কেমন অবিশ্বাসী, তা কিন্তু আমি খুব জানি, হ্যাঁ!”

সন্ধানী তার মায়ের হাতটা বাঁ-হাতে নিয়ে বলল, “তুমি কিচ্ছু ভেবো না, মা। আমায় নিয়ে তোমার সে ভয় করতে হবে না।”

আশ্বস্ত হওয়ার হাসি হাসলেন কল্যাণী। দুজন নীরবে খেলেন কিছুক্ষণ। তারপর সন্ধানী বলল, "আচ্ছা মা! সব ধর্মই তো সত্য, তাই না?"

"অবশ্যই," কল্যাণী দেবীর জবাব, "ঈশ্বর তো একজনই। কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছানোর পথ একেকজনের একেক রকম। সবই তাঁর কাছে গিয়েই শেষ হয়।"

"তাই বলে এত পার্থক্য? কোথাও গোহত্যা পাপ, কোথাও গরু কাটা উৎসব। কেউ প্রতিমাকে গড়প্রণাম করে, তো কেউ মূর্তি ভাঙতে পারলে বাঁচে। ঈশ্বর এত এপ্রিশিয়েটিভ কেন?"

"বা রে! তুইই তো আমাকে দেখালি না যে ইংরেজিতে ছয় লিখে সেটাকে উলটে দেখলেই নয় হয়ে যায়? মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হয় রে, মা। কেউ না হয় গাভী জবাই করে গরিবদের মাংস বিলিয়েই খুশি হয়। বিশ্বাস কর, ঈশ্বরের তাতে কোনো আপত্তি নেই।"

"ঈশ্বর তো অমন নয়-ছয় হওয়ার কথা না, মা। আচ্ছা আমাকে বোঝাও তো, সূর্যকে প্রণাম করলে তোমার আপত্তি নেই। কারণ ভগবান তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিরাজ করেন। আমি যদি এখন সন্ত্রাসী বদরুলকে প্রণাম করি? তার ভেতর কি ভগবান নেই?"

মাথায় হাত দিয়ে কল্যাণী বললেন, "আরে অত কঠিন কথা আমার মাথায় ঢোকে না রে, সোনু। বুড়ো বয়সে আমার মাথাটা খাবি নাকি?"

সন্ধানী দ্রুত সামলে নিয়ে বলল, "না, না। মানে মোট কথা হলো স্রষ্টা আর সৃষ্টি একই সত্তা হতে পারে না। এটাই বললাম আরকি।" দ্রুত কথা শেষ করে চুপচাপ খেতে লাগল সন্ধানী। বেশি বিরক্ত করে ফেলেছে মা-কে।

বাসনকোসন ধুতে ধুতে কল্যাণী আবার কথা শুরু করলেন। মাঝে মাঝে কঠিন লাগলেও মেয়ের সাথে কথোপকথন এনজয় করেন তিনি। "হ্যাঁ রে, সোনু। তুই যে আজকাল পালা-পার্বণেও যোগ দিস না! মূর্তিপুজো না করলি, ভাই-বোনগুলোর সাথে একটু মজাটজা তো করতে পারিস, নাকি?"

"করিই তো, মা।" রান্নাঘরের মেঝে ঝাড়ু দিতে দিতে বলল সন্ধানী, "কোনো পুজোয় কাউকে গিফট দিতে বাকি রাখি আমি?"

"তা রাখিস না। কিন্তু নিজেও তো একটু আনন্দ করতে পারিস। ঢাকের বাড়ি শুনলে তো এ বয়সেই আমার মনপ্রাণ দুলে ওঠে। আর তুই কিনা এককোনায় গুটিয়ে যাস। ইন্দ্র সেদিন দুঃখ করে আমাকে বলল, দেখো তো কাকী! দোলযাত্রা চলে গেল। আর আমার দিদিটার গালে একটু রঙও দিতে পারলাম না।"

ইন্দ্রের নাম শুনতেই ঘৃণায় গা রি রি করে উঠল সন্ধানীর। কিছুক্ষণ কথা না বলে চুপ রইল সে। ধোয়া বাসনগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলল, "আচ্ছা মা, তোমার কি মনে হয় না যে মূর্তিপূজা আর নির্লজ্জতা দুই বোনের মতো হাত ধরে হাঁটে?"

"কী বলতে চাস?" ভ্রু কোঁচকালেন কল্যাণী।

"তুমি একটু চোখ খুলে দেখো, মা। আমাদের দেবদেবীর পোশাকগুলোই দেখো। পূজারিদের দেখো। আমার তো মনে হয় এই গানবাজনাগুলো নোংরামি উসকে দেয়! নারী-পুরুষ মিলে মাতালের মতো নাচে। এখানে ঈশ্বরের আরাধনার সৌন্দর্য কোথায়?"

কল্যাণী কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "আসলে তুই যেমন ভাবছিস, তা না। ভগবান শিবের তাণ্ডবনৃত্য দিয়ে জগতের সৃষ্টি, ধ্বংস, পুনঃসৃষ্টি বোঝায়। তা ছাড়া আমাদের নাচ ভগবানদেরও মনোরঞ্জন করে। ওসব পশ্চিমাদের বিশ্রী নাচানাচির কথা জানি না। আমাদের ভারত উপমহাদেশের পুজোর নাচ অনেক সুন্দর। এটা ভগবানের আরাধনারই একটা রূপ।"

সন্ধানী অসহায় ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "তুমি জানো মা, আমাদের এসব নাচানাচির দৃশ্য পর্ন হিসেবে ইন্টারনেটে পাওয়া যায়? কী হিন্দু, কী মুসলমান, কারও ল্যাপটপ ঘাঁটলেই...." কথা আটকে গেল সন্ধানীর।

চুপ করে রইলেন কল্যাণী। নিজেও যে মাঝে মাঝে এমনটা ভাবেননি, তা নয়। হয়তো সবার মনেই মাঝে আসে এসব। কেউ হয়তো কল্যাণীর মতো মাথা ঝাড়া দিয়ে সেসব চিন্তা দূর করে। কেউ বরং খুশিই হয় নষ্টামোর সুযোগ পেয়ে।

সন্ধানীকে কাছে টেনে বললেন, "কাল থেকে ভার্সিটি খোলা না তোর? প্রতিদিন ফোন দিবি তো আমায়?"

"হলে থাকলে কোনোদিন তোমাকে ফোন না দিয়ে চলে আমার?"

চোখের পানি মুছল দুজনই।

আ ট্রিবিউট টু হকিং

অনুষদ ভবনের তিন তলায় গিয়ে পরিচিত মুখ খোঁজাখুঁজি করতে লাগল সুদীপ্ত। জাহিদকে কয়েকজনের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গিয়ে ডাক দিল, "দোস্ত।"

"কী খবর?"

"এই তো। তোদের ফোর্থ ইয়ারের ক্লাস কোন রুমে রে?"

"সে তো ফোর্থ ইয়ারের সি আর।" সামনে দাঁড়ানো ছেলেটাকে দেখিয়ে বলল জাহিদ, "পলাশ, এ হচ্ছে তোমার সুদীপ্ত ভাই, ফাইন আর্টসে পড়ে। আমার হলের ফ্রেন্ড।"

পরিচিত হয়ে হাত মেলাল পলাশ। সুদীপ্ত বলল, "তোমাদের ক্লাসের সন্ধানী সেনকে খোঁজ করল আমাদের মৃদুল স্যার। একটু ডেকে দিতে পারবা?"

"আচ্ছা ভাই, একটু দাঁড়ান। আমি ডেকে দিতেছি।" পলাশ চলে গেল।

একটু পর ফিরে এল একটা মেয়েসহ। মেয়েটা নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত তুলল। সুদীপ্ত বলল, "তুমি সন্ধানী?"

"জি।"

"আচ্ছা, আমি সুদীপ্ত। ফাইন আর্টস ডিপার্টমেন্ট, মাস্টার্সে আছি। মৃদুল স্যার একটু আসতে বলেছে তোমাকে।"

"আচ্ছা, চলেন।"

দুজন সিঁড়ি বেয়ে চারুকলা বিভাগে নামছে। সুদীপ্ত বলল, "তুমি স্টিফেন হকিং কন্টেস্টে ছবি জমা দিসো, না?"

"জি।"

"ওইটা নিয়েই কথা বলবে মনে হয়। স্যার তো কন্টেস্টের মেইন বিচারক।"

"আচ্ছা, আচ্ছা।"

অধ্যাপক মৃদুল ভৌমিকের রুমের ভেতর উঁকি মেরে সুদীপ্ত বলল, "স্যার, এসেছে।"

"ও হ্যাঁ, ভেতরে আসতে বলো।" কাঁচাপাকা ঝাঁকড়া চুল নেড়ে বললেন মৃদুল স্যার। রুমে ঢুকে মৃদুল স্যারকে নমস্কার জানাল সন্ধানী। স্যার বললেন, "Please, take a seat."

"Thank you, Sir."

মৃদুল স্যারকে কেমন একটু অপ্রস্তুত লাগছে। মনে হলো জোর করে স্বাভাবিক গলায় কথা বলার চেষ্টা করছেন। বললেন, "কন্টেস্টে চারুকলার বাইরের স্টুডেন্টদের অংশগ্রহণই তুলনামূলক বেশি দেখছি। হা হা হা!"

সন্ধানী জবাবে ভদ্রতার হাসি দিল। স্যারের টেবিলে প্রায় সমান সাইজের বড়ো দুটি বান্ডেল রাখা। দুটি বান্ডেলের গায়েই সাঁটা খয়েরি রঙের খামের মতো কাগজ। তাতে লেখা "Inter-Department Drawing Contest: A Tribute to Stephen Hawking 2018"। একটি খামের নিচে লেখা "Fine Arts", অপরটিতে "Others"।

Others লেখা বান্ডেলটা থেকে স্যার একটি কাগজ তুলে দেখলেন। তারপর সন্ধানীর হাতে দিতে দিতে বললেন, "এটা এঁকেছে জিওগ্রাফির মুস্তফা।"

সন্ধানী সেটা হাতে নিয়ে দেখল। পৃথিবীর একাংশ, তার উপর হকিং-এর বিখ্যাত সেই চেয়ার। তার উপর বাতাসে ভাসতে ভাসতে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে হাস্যোজ্জ্বল হকিং-এর দেহ। সন্ধানী এখনও বুঝতে পারছে না স্যার তাকে এগুলো কেন দেখাচ্ছেন। তারপরও বলল, "অসাধারণ আঁকা।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" বলতে বলতে স্যার আরও দুটো ছবি এগিয়ে দিলেন সন্ধানীর দিকে, "আর এখানে একটা ফিন্যান্সের শর্মিলা, আরেকটা হিস্ট্রির রাফির আঁকা।"

সে দুটোও সন্ধানী হাতে নিয়ে দেখল। একটায় কালো আকাশে বিন্দুর মতো হাজারও তারা আঁকা। কয়েকটা তারা রেখা দিয়ে যোগ করে বানানো হয়েছে সেই চেয়ার। আর আরও কিছু

তারা যোগ করে বানানো হয়েছে ছায়ার মতো একটি দেহ, যা দুহাত বাড়িয়ে অসীমকে জড়িয়ে ধরতে এগিয়ে যাচ্ছে। আরেকটি ছবিতে মিল্কি ওয়ের ছবি। ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যায়—স্টিফেন হকিং-এর চেহারা পুরো মিল্কি ওয়েতে আবছাভাবে ফুটে উঠেছে।

"দুটোই খুব সুন্দর।"

"হ্যাঁ, আজ সকালেই দেখছিলাম এই বান্ডেলটা।" বলতে বলতে চতুর্থ কাগজটা হাতে নিলেন স্যার। কিন্তু এটা সন্ধানীকে না দিয়ে নিজের কোলের উপর রেখে কেমন ক্লান্তভাবে চেয়ে রইলেন।

অস্বস্তিকর নীরবতা। সন্ধানী গলা উঁচিয়ে দেখতে চেষ্টা করল সেই ছবিটি। হ্যাঁ, এটা ওর নিজের আঁকা। রঙবিহীন পেন্সিল স্কেচ। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "স্যার, আমি আসলে আঁকাআঁকি পারি না। মাথা বড়ো এঁকে ফেলি। অনুপাত সম্পর্কে আইডিয়া নেই।"

"হুঁ?" হঠাৎ যেন খেয়াল করলেন মৃদুল স্যার, "না, সেটা বলছি না। কিন্তু... কিন্তু আইডিয়াটা একেবারে...।"

ছবিটা তুলে চোখের সামনে ধরে ভালো করে দেখতে লাগলেন। পৃষ্ঠার ঠিক মাঝ বরাবর একটা সরলরেখা। উপরের অংশে একটা অন্ধকার রুমে হকিং-এর সেই চেয়ারটি। কিন্তু জং ধরা, মাকড়সার জাল ভরা, কোথাও কোথাও ভেঙে পড়া অংশ কাপড়ের টুকরো দিয়ে বাঁধা। আর সরলরেখার নিচের অংশে কিলবিল করছে কতগুলো পোকামাকড়। সেগুলোর মাঝে আধখাওয়া একটি মানবদেহ, কোথাও সামান্য চামড়া, কোথাও একেবারে হাড্ডিসার।

সন্ধানী কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য তৈরি হলো। বলতে শুরু করল, "আসলে স্যার, স্টিফেন হকিংকে অসম্মান করা মোটেই আমার উদ্দেশ্য না। আমি ইন্টারনেটে যেসকল ট্রিবিউটারি আর্ট দেখলাম, সবগুলোর আইডিয়া মোটামুটি একই। স্টিফেন হকিং মহাকাশে বা অসীমে, তারার ভেতর বা গ্যালাক্সির সাথে মিশে যাচ্ছেন। তাই আমি বাস্তবতাটা আঁকার চেষ্টা করলাম। আমার কাছে মনে হয়েছে এভাবেই আমরা বিজ্ঞানীদের সম্মান জানাতে পারি। তাঁরা আমাদের বাস্তববাদী হতে শিখিয়েছেন। কল্পনায় ওয়ান্ডারল্যান্ড না বানিয়ে বিষণ্ন বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার সাহস জুগিয়েছেন।"

শুনতে শুনতে ছবিটা নামিয়ে রেখে এক হাতে চশমা খুলে আরেক হাতে চোখ ডলতে লাগলেন মৃদুল স্যার। ভয়ংকর সুন্দর একটা আর্ট। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। চোখব্যথা হয়। আর্টের পেছনে তার চেয়েও ভয়ংকর সুন্দর ফিলোসফি। তাও বেশিক্ষণ ভাবা যায় না। মাথা ধরে আসে।

তারপর বললেন, "আচ্ছা সন্ধানী, তোমার কী মনে হয়? কেন কেউ হকিংকে মাটির নিচে কল্পনা করতে পারছে না? কেন তাঁকে সবাই উপরে কল্পনা করছে? অসীম মহাশূন্য, তার মাঝে ছোট্ট একটা পৃথিবী। এখানে উপর কী, আর নিচ কী? সবই কি সমান নয়?"

সন্ধানী একবার ঢোক গিলল। বলল, "স্যার... আমার মনে হয়, মনের এক কোনায় সবাই-ই আমরা জানি *afterlife* বলে কিছু আছে। এটা আমাদের সফটওয়্যারে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। আমরা..."

"কে গেঁথে দিল?" কথা কেড়ে নিয়ে বললেন স্যার।

"ঈশ্বর perhaps!" অনিশ্চিত ভঙ্গিতে শ্রাগ করল সন্ধানী।

চশমা পরতে পরতে স্যার বললেন, "এজন্যই কি আমরা মৃত ব্যক্তিকে বলি *'Rest in peace'*?"

"জি স্যার, আমারও তা-ই ধারণা।"

আরও কিছুক্ষণ নীরবতা। নীরবতা ভাঙলেন স্যার, "কেন? বাস্তবতা মেনে নিলে হয় না? আমাদের সবাইকেই পোকায় খেয়ে ফেলবে। হকিং-এর মতো। কেমিক্যাল দিয়ে সংরক্ষণ করা লাশগুলোও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে ইউনিভার্সের সাথে।"

স্যারের দিকে না তাকিয়েই যেন আনমনে বলে চলল সন্ধানী, "তা হলে কি ভালো আর মন্দ সমান হয়ে যাবে? দানশীল লোকটাও মরে শেষ হয়ে গেল, চোরটাও মরে গিয়ে বেঁচে গেল?"

হালকা স্পিডে ছেড়ে রাখা ফ্যানের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই রুমটায়।

স্যার আবার বললেন, "হয়তো চোর-ডাকাতরা আবার পৃথিবীতে জন্মাবে শাস্তি পাবার জন্য। হয়তো মশা হয়ে, তেলাপোকা হয়ে। চড় খেয়ে, পায়ে পিষে মারা যাবার জন্য।"

শুকনো হাসি হেসে সন্ধানী বলল, "জি, স্যার। আমার ছয় মাসের খুড়তুতো ভাইটাকে আর আদর করব না তা হলে। পূর্ব জনমে বড়ো কোনো পাপ না করে থাকলে বিকলাঙ্গ হয়ে কেন জন্ম নিল সে?"

আবারও নীরবতা।

সন্ধানী এবার নীরবতা ভাঙল, "স্যার, একসময় বন্ধুদের সাথে আমার খুব তর্কবিতর্ক হতো। পৃথিবীতে এত দুঃখ-কষ্ট, অপরাধ। ঈশ্বর এগুলো থামান না কেন, এই নিয়ে একদিন ওরা সবাই মিলে ধরেছিল আমাকে। সেদিন হঠাৎ করে উত্তর মাথায় আসে নাই। অথচ এর একটু আগেই স্বর্গ-নরক নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। পরে বুঝেছি। এই পৃথিবীতে সবকিছুর সুবিচার হবে না। স্রষ্টা এই জগৎকে এভাবেই সিস্টেম করে দিয়েছেন। এজন্যই স্বর্গ-নরক আছে। পৃথিবীতে যদি কোটি কোটি বছরও অবিচার হয়, পরকালের সুবিচার অসীম। অসীমের তুলনায় কোটিও শূন্যের কাছাকাছি হয়ে যাবে, স্যার। সিম্পল ম্যাথ।"

"তা হলে," স্যার বললেন, "এই যে মাটির সাথে পচে-গলে মিশে যাওয়া হাড়গোড়, এগুলো বুঝি আবার সতেজ হয়ে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াবে বিচার হওয়ার জন্য? এটা কি সম্ভব?"

সন্ধানী লম্বা একটা দম নিল। তারপর বলল, "আচ্ছা স্যার, মানুষ আর বিশ্বজগৎ এই দুইটার মধ্যে কোনটাকে সৃষ্টি করা বেশি কঠিন?"

"স্রষ্টার কাছে আবার কঠিন সহজ কী?"

"সেটাই তো, স্যার! যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করলেন, তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন।" বলতে বলতে সন্ধানীর গলা কেমন ধরে এল। মুখে ওড়না চাপা দিয়ে কান্নার গমক আটকাল।

"স্যার, এখন আপনার ক্লাস।" দরজায় উঁকি মেরে বলল সুদীপ্ত।

"আসছি।" জবাব দিলেন স্যার।

সুদীপ্তর মনে হলো, "স্যারের চোখ দুটো কেমন ছলছল করছে। অবশ্য স্যারের সোনালি ফ্রেমের চশমাটা দূর থেকে দেখলে প্রায়ই এরকম মনে হয়। আর ওই মেয়েটা এমন মাথা নিচু করে বসে আছে কেন? তার আঁকা ছবি মনে হয় স্যারের পছন্দ হয়নি। এটা শুনেই সেন্টি খেয়ে গেছে। আরে বাবা, এটা কি বিজ্ঞান নাকি যে সবাই বুঝবে? এটা আর্ট! জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা করে এটা রপ্ত করতে হয়।"

সুদীপ্তর সামনে দিয়েই ফোনে কথা বলতে বলতে বের হয়ে গেল মেয়েটা, "হ্যাঁ, ইলমা? ক্লাস শুরু হয়ে গেছে? না, ফোন সাইলেন্ট ছিল। তোর কল শুনি নাই।"

"নাহ!" ভাবল সুদীপ্ত, "একে তো বেঁটে, কালো; তার উপর এত্ত ইমোশনাল। নাহ, একে সম্ভাব্য প্রেমিকার লিস্টে রাখা যাচ্ছে না।"

গুরুদণ্ড

জানালা-দিয়ে-আসা ভোরের আলোয় খাতা দেখছিল সন্ধানী। যে এইচএসসি কোচিং সেন্টারে ক্লাস নেয় ও, সেখানকার মডেল টেস্টের। এগুলোর ব্যস্ততায় ধ্যান করতে ছাদে যাওয়া হলো না আজও। রুমমেটরা ঘুমে থাকতে থাকতে নীরব পরিবেশে যতটুকু কাজ এগিয়ে নেওয়া যায়।

কাজ করতে করতে তন্দ্রায় মাথা ঠেকে গিয়েছিল ডেস্কে। আর্ত চিৎকার শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। আশেপাশে তাকিয়ে দেখল রুমমেট শর্মিষ্ঠা দরজা খুলে বারান্দায় গেছে, কী হচ্ছে দেখার জন্য। রেবা বিছানায়ই অপেক্ষা করছে অন্যেরা আপডেট এনে দেবে বলে। আর চারুর ঘুমই ভাঙেনি। মানুষের স্বভাববৈচিত্র্যের এই একটা ঝলক সন্ধানীকে কেমন অভিভূত করল।

কিন্তু চেঁচামেচি কীসের, তা তো দেখা হলো না। সন্ধানীও বারান্দায় এল। হলের বাগান পেরিয়ে প্রধান ফটকের কাছে দারোয়ান ফরিদ মামা ৯-১০ বছর বয়সী একটা ছেলেকে জাপটে ধরে আছেন। মোটা লাঠি দিয়ে তাকে ধুম পেটাচ্ছেন আরেক দারোয়ান আ. জব্বার মামা। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন বাগানের মালি মালেক মামা। তিনি ঘাস কাটার ধারাল অস্ত্রটা দিয়ে ছেলেটিকে ভয় দেখানোর ভান করছেন। ছেলেটা চিৎকার করে চলেছে—"আর চুরি করুম না। আব্বা গো, চাচা গো, আর চুরি করুম না। আল্লার কিরা, আব্বা। মামা রে, আর মাইরেন না। মা গো, গেলাম গো। আমারে মাইরা ফালাইল! আম্মা, আমারে বাঁচান!..."

হলের সব ব্লকের বারান্দায় কেউ-না-কেউ বেরিয়ে এসে তাকিয়ে আছে। অন্য সবার মতোই সন্ধানীরও কেমন চাপা কান্না পাচ্ছে ছেলেটার চিৎকার শুনে। কয়েক জায়গা থেকে বেশ

কয়েকজন ক্ষীণ কণ্ঠে বলছে, "ফরিদ মামা, এবার ছেড়ে দেন।" সন্ধানী হঠাৎ খেয়াল করল শর্মিষ্ঠা পাশে নেই। এদিক-ওদিক খোঁজ করতেই নিচে দেখল শর্মিষ্ঠা একটা পানির বোতল হাতে বাগান পেরিয়ে গেটের দিকে যাচ্ছে। সন্ধানীও পেছন পেছন দৌড় দিল।

"খালা, আপনে সরেন, খালা।" চোরটাকে জোর করে টেনে এনে পানি খাওয়াতে যাচ্ছে দেখে শর্মিষ্ঠাকে বলল আ. জব্বার। শর্মিষ্ঠা কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে ছেলেটাকে পানি খাওয়াল। একদম পুলিশি কায়দায় নির্যাতন হয়েছে। পেটানো হয়েছে খুব, তবে খেয়াল রাখা হয়েছে—রক্ত যাতে না বেরোয়।

কয়েক ঢোক পানি গিলে শর্মিষ্ঠার পা জড়িয়ে ধরতে নিল ছেলেটা। ফরিদ মিয়া "ওওওইই!" বলে তাকে হিড়হিড় করে আবার টেনে নিয়ে মারতে শুরু করল। সন্ধানী ততক্ষণে এসে ছেলেটার গায়ের উপর পড়ে গিয়ে বলল, "মামা! আর না! অনেকক্ষণ ধরে মারতেছেন।"

এরই মাঝে আরও বেশ কয়েকজন ছাত্রী নেমে এসে একই কথা বলতে লাগল। প্রায় ১০-১৫ মিনিট নাকি হয়ে গেছে পেটানো শুরু করার পর থেকে। ছেলেটা ওইদিকে এক টানা বলেই চলেছে, "আল্লার কসম! আর চুরি করুম না। আমার আম্মা দুইদিন না কাইয়া আছে। ছোড বৈনডা না কাইয়া আছে, খালাম্মা। বাইধ্য হইয়া চুরি করতে আইছি, খালা।"

সবাই মিলে ছেলেটাকে কিছু টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে ছেড়ে দিতেই সে যে এক ভোঁ দৌড় দিয়ে হারিয়ে গেল, আর টিকিটাও দেখা গেল না। সবাই রুমে ফিরে যেতে উদ্যত হলে মালেক মামা বললেন, "খালামণিরা। আইচ্ছা কয়ডা পশ্নের উত্তর দিয়া যান ছে। পোলা এইডা এত কসমটসম করনের পরও কাইলকাই যে আবার অন্য অ্যালাকায় চুরি করতে যাইব, এইডা আপনেরা জানেন?"

বেশিরভাগ মেয়েই অস্বস্তিকর প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে নিজ নিজ রুমের দিকে হাঁটা দিল। শর্মিষ্ঠা বলল, "জানি, মামা।"

মালেক মিয়া আবার বলল, "হ্যার মা-বোইন কেউ না খায়্যা আছিল না। সব মিছা কথা কইছে। এইডা জানেন?"

"জি, জানি।"

"আপনেগো দেওয়া ট্যাকাপয়সা লইয়া এখন আঠা দিয়া নেশা করব। জানেন?"

সন্ধানী বলল, "জানি, মালেক মামা। সব জানি। এই শর্মি, চল।" দুজনই রুমে চলে গেল।

আ. জব্বার মিয়া গোঁফের আগা মুচড়ে বলল, "মায়া মাইনষেরে লইয়া এই এক সমেস্যা। কদ্দূর চোখের পানি ফেলাইয়াই তিনাদের মন গলায় ফালান যায়।"

"এই হচ্ছে কাহিনি।" বিছানা ছেড়ে এক চুলও না-সরা রেবার কাছে কাহিনি বর্ণনা শেষ করে বলল শর্মিষ্ঠা।

"অ।" বলে আবার শুয়ে পড়ল রেবা।

কিছু করার না পেয়ে সন্ধানীর বিছানায় এসে বসল শর্মিষ্ঠা। একটু পর বলল, "আচ্ছা সন্ধানী, এই বিষয়টা অদ্ভুত না যে আমরা একজন স্যাডিস্ট-ঈশ্বরের-তৈরি-করা পৃথিবীতে থাকি?"

সংশয়বাদীদের এমন অনেক কথাই শোনা আছে সন্ধানীর। এক লাইন শুনেই রেগে না গিয়ে বলল, "সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করিয়া শোনাও হে জ্ঞানী।"

শর্মিষ্ঠা বলল, "ফাজলামো রাখ। এই যে আমরা মানুষেরাই আরেকটা মানুষের *suffering* বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলাম না। অথচ ঈশ্বর ঠিকই পাপী-ভক্তদের নরকে, পাতালপুরীতে আগুন-ধোঁয়া-লাকড়ি-জ্বালানি-লোহা-চ্যালাকাঠ দিয়ে পিটায়া, পিটায়া, শাস্তি দিয়ে মেরে-কেটে-জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে আবার নতুন করে রিচার্জ করে আবার শাস্তি দেবেন, আবার রিচার্জ করবেন, আবার শাস্তি দেবেন... কিন্তু, কিন্তু, তিনি আমাদের সবাআআইকে ভালোবাসেন! একজন দয়ালু ঈশ্বর এমন স্যাডিস্ট হওয়া কীভাবে সম্ভব?"

সন্ধানী বলল, "এবার কনক্লুশনটা বল। 'আমি কিন্তু নাস্তিক না। এমনি এমনি হরলিক্স খাই'।"

শর্মিষ্ঠা বলল, "হ্যাঁ, ওটাই। আমি গড়ে বিলিভ করি। আমি শুধু এই প্রশ্নের জবাব মেলাতে পারতেছি না।"

"নাকি যেসব প্রশ্নের জবাব মেলাতে পারতেছিস না, এইটা তার মধ্যে একটা?"

"হ্যাঁ, কাইন্ড অব ওইরকম, এক কোটি প্রশ্নের মধ্যে এইটা একটা।"

সন্ধানী খাতাগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, "শর্মি, আমাদের আগে নিজেদের স্কেলে ঈশ্বরকে বিচার করা থামাইতে হবে। নিজেদের অক্ষমতা ঈশ্বরের উপর আরোপ করা যাবে না।"

"অক্ষমতা?" ভ্রু উঁচু করল শর্মিষ্ঠা, "দয়া করা অক্ষমতা?"

"অবশ্যই। যেইখানে শাস্তি দরকার, ওইখানে দয়া করা অক্ষমতা না? নরকের শাস্তি চোখের সামনে দেখলে যে-কেউই আরেকটা চান্স চাইবে। একদম দিব্যিটিব্যি করে বলবে, 'এইবার ভালো হয়ে যাব'। ঈশ্বর যদি মানুষের মতো অক্ষম হইতেন, তিনি এ কথাটা মিথ্যা জেনেও আরেকটা সুযোগ দিতেন—এই দয়ার কারণেই। সেই মুহূর্তে আরেকটা সুযোগ না দিলেও নরকে তাদের চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে পরে ক্ষমা করে দিতেন। এখানেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। শাস্তি যার পাওনা, তার চিৎকার ইগনোর করতে পারাটাই ঈশ্বরের ইউনিকনেস। এই ইউনিকনেস দিয়ে উনি মানুষকে সৃষ্টি করেন নাই। আমরা আমাদের স্কেলে বিচার করে ঈশ্বরকে স্যাডিস্ট ভাবতে পারি। আসলে আমরাই ঈশ্বরের স্কেলে একেকটা অক্ষম দুর্বল প্রাণী, যেগুলাকে আমরা নিজেদের দয়া ভেবে ভুল করতেছি।"

শর্মিষ্ঠাকে রেবা আঙুলের ইশারায় ডাকল। মনে করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, "ঈশ্বর কি দয়ালু না ন্যায়বিচারক, ওই প্রশ্নটা।"

এদিকে সন্ধানী খাতাগুলো নিয়ে বেশ গলদঘর্ম হচ্ছে। শর্মিষ্ঠা বলল, "থাক, এই প্রশ্ন পরে। বেচারির কাজ শেষ হোক। এই অবস্থায় এমন প্যারাডক্স নিয়ে ব্রেইন স্টর্মিং করলে দুইটার একটা কাজও ঠিকমতো হবে না।"

"না, এখনই কর।" বলল সন্ধানী। "মে বি আমি উত্তরটা দেওয়ার মতো লাইনেই আছি।"

রেবা আগ্রহ নিয়ে উঠে এল।

সন্ধানী বলল, "আমার মনে হয়... আমার মনে হয় ঈশ্বর একইসাথে দয়ালু আর ন্যায়বিচারক।"

"এইটা কেমনে সম্ভব?" শর্মিষ্ঠা বলল, "দয়া করলে ন্যায়বিচার বাদ যাবেই। আর ন্যায়বিচার করলে দয়া করার জায়গা কই?"

"আমিই তো খাতা দেখতে গিয়ে একইসাথে দয়া আর ন্যায়বিচার করতেছি। যে ভালো লিখসে, তাকে পাওনার চেয়ে বেশি দিতেসি। যে খারাপ লিখসে, তাকে তার পাওনা মার্কস দিতেছি।"

"কিন্তু," রেবা বোকার মতো বলে উঠল, "এইটা তো গ্রেডিং সিস্টেম। একজন বেশি পাইলে আরেকজনের সমস্যা নাই।"

"হ্যাঁ, তো?"

রেবা চুপ।

সন্ধানী বলল, "পাপ-পুণ্যের বিচারটাও তো এমনই, তাই না? যার যার পাপের সাথে তার তার পুণ্যের তুলনা।"

শর্মিষ্ঠা শেষ দুর্বল চেষ্টাটা করল, "কিন্তু কাউকে তার পাওনার চেয়ে বেশি পুণ্য দিলে স্বর্গে জায়গার শর্ট পইড়া যাবে না?"

"আবারও মানুষের স্কেলে ঈশ্বরকে বিচার? দ্যাখ, পৃথিবীতে যতদিন কলমের কালি থাকবে, আমি মার্কস দিয়ে যাইতে পারব। তেমনি ঈশ্বর শূন্য থেকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন বলে তিনি যাকে যত চান, ততই দয়া করে যেতে......"

"অ্যাই তোরা চুপ কর তো। ঘুমাইতে দে।" বিছানা থেকে বলে উঠল চারু।

গুরুগম্ভীর ধর্মতাত্ত্বিক আলাপ থামিয়ে দিল তিনজনই। পানির বোতল তিনটিই কানায় কানায় পানিপূর্ণ করল। তারপর এগিয়ে গেল চারুর বেডের দিকে।

সত্যায়ন

দরজা খুলে দিতেই হাত জোড় করে একেবারে পূজা-করার ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে দিল সেঁজুতি। সন্ধানী একটু অস্বস্তি ভরে এক পাশে সরে গেল। সেঁজুতিকে একই ভঙ্গিতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার প্রণামের-ভঙ্গি করা হাতে হালকা চাপড় মেরে বলল, "ধ্যাত! করিস কী এসব?"

"কেন? দেবীকে প্রণাম করি!" হাসতে হাসতে সেঁজুতির জবাব।

"প্রতিমা তো ভেতরে, পূজা ঘরে।"

"আরে তুইই তো আমার দেবী।" বলল সেঁজুতি।

সন্ধানীর চেহারায় এখনও অস্বস্তির ভাব, "আরে ধুর। আয়, ভেতরে আয়।"

ভেতরে এসে নিজেই দরজা আটকাতে আটকাতে সেঁজুতি বলল, "এবার কি ভ্যাকেশন দেরিতে দিল তোদের?"

"না, না। ভ্যাকেশন টাইমলিই দিছে। আমি অন্য সময় আগে আগে চইলা আসি। এইবার টাইমলি আসলাম, এই আরকি।"

কোথাও যাবার জন্য বের হচ্ছিলেন সুব্রত বাবু। তাকে ড্রয়িং রুমে ঢুকতে দেখে সেঁজুতি প্রণাম জানাল, তিনিও জবাব দিলেন। সন্ধানী দরজা খুলে দিয়ে এল।

বাবার বিদায় দিয়ে ফিরে এসে সন্ধানী বলল, "চল, রুমে গিয়া বসি।"

"তা এইবার দেরি হলো ক্যান? পরীক্ষাটরীক্ষা ছিল?" সন্ধানীর পেছন পেছন তার রুমে যেতে যেতে বলল সেঁজুতি।

"না। কিছু জিনিস অ্যাটেস্ট করার দরকার ছিল। কয়েকদিন ধরে জমা দিয়ে রাখসি প্রোভোস্টের অফিসে। কিন্তু ম্যাম দিনের-পর-দিন অ্যাবসেন্ট। একদিন ঢাকার বাইরে, আরেকদিন অসুস্থ, আরেকদিন উনার পোলার অসুখ... এই করতে করতে দেরি হয়ে গেল।"

"আরে পিওনকে দিয়ে সিল মারায়া আইনা নিজে খসখস করে একটা সাইন বসায়ে দিবি আরকি!" বিছানা দখল করে বসতে বসতে সেঁজুতির সাজেশন। "দরকার হলে পুরাতন কাগজ থেকে প্রোভোস্টের সাইন দেখে নিবি।"

"সেইটা করলে তো সিলই বানানো যায়।" একটা চেয়ার টেনে বসে উত্তর দিল সন্ধানী, "কিন্তু 'সত্যায়নে'র কিছুই তো আর বাকি থাকল না তখন।"

"বাথরুমগুলাই সত্যায়িত হয়ে যাইতেছে, সেইখানে কাগজপত্র আর এমন কী?"

"মানে?" ভ্রু কুঁচকাল সন্ধানী।

সেঁজুতি "দেখাচ্ছি।" বলে ফোন বের করল। একটা ছবি বের করে সন্ধানীর দিকে ধরল। দেয়ালে-সাঁটা একটি বিজ্ঞাপনের ছবি। সেখানে লেখা,

"১লা নভেম্বর থেকে রুম ভাড়া হইবে। অ্যাটাচড বাথরুম সহ। ১ জন চাকরিজীবী/২ জন ছাত্র। যোগাযোগের ঠিকানা........"

"অ্যাটাচড বাথরুমটা অ্যাটেস্টেড বাথরুম হয়ে গেসে আরকি।" বলল সেঁজুতি।

"হুম। তাও ভালো, বাথরুমটা ভাতরুম হয় নাই।"

"তা হলে সেইটা কিচেন বা ডাইনিং রুম হয়ে যেত।"

সেঁজুতি হঠাৎ ঝট করে সোজা হয়ে বসে আগের মতো হাত জোড় করল, "তো দেবী মাতা। এইবার দীক্ষা দিন।"

সন্ধানীকে এবার প্রচণ্ড বিরক্ত দেখাচ্ছে, "এইটা কী শুরু করলি, হ্যাঁ!"

"কেন? তোর সাথে কথা হইসিল না, তুই যেই ধর্ম মানবি আমিও সেইটা মানব? অনেক দিন তো দেখা দিলি না। ফোনেও কিছু বলিস না। ইদানীং তো মেসেঞ্জারেও পাওয়া যায় না। আজকে দীক্ষা দে দেবী।"

সন্ধানীর মনে হলো আগের আচরণের কারণে এতদিন সেঁজুতিকে ইগনোর করা ঠিক হয় নাই। বলল, "ওকে। তোর প্রথম দীক্ষা হইল, ফেসবুকের প্রোফাইল পিকচার পরিবর্তন করবি।"

"ক্যান? ভালো জিনিসই তো।"

"না, পুরাই ফাউল।"

সেঁজুতি অনেকক্ষণ সময় লাগিয়ে ফোন থেকে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগইন করল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল তার প্রোফাইল পিকচারটার দিকে। গৌতম বুদ্ধের একটি ছবি। সেই সাথে তাঁর একটি উক্তি, "কোনো কিছু শুনলেই বিশ্বাস কোরো না। লোকে বলে বলেই বিশ্বাস কোরো না। ধর্মগ্রন্থে আছে বলেই বিশ্বাস কোরো না। পণ্ডিতরা বলেছেন বলেই বিশ্বাস কোরো না। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রথা হয়ে ছিল বলেই বিশ্বাস কোরো না। বরং নিজে পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণ করে যদি দেখো সেটি যৌক্তিক এবং কল্যাণকর, তা হলেই কেবল সেটা গ্রহণ কোরো।"

"আইরনিটা কী, জানিস?" সন্ধানী বলল, "কিছুই বিশ্বাস কোরো না, তবে এই কথাটা ছাড়া। আবার এটাই যে বুদ্ধের উক্তি, এইটাই যে সঠিক ট্রান্সলেশন, এটাও এমনি এমনিই বিশ্বাস করবা।"

"এখানে মোটেও এই অর্থে..." প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেল সেঁজুতি। "না, না। আমি তো তোর শিষ্য। আগে তোর কথা শুনি। সঠিক ট্রান্সলেশন কী তা হলে?"

"সে ব্যাপারে আমি কোনো সিদ্ধান্ত দিব না অবশ্যই। কারণ আমি নিজেই মূল সোর্স থেকে তা পড়ি নাই। কিন্তু এই কোটেশনটার অন্য ভার্শন আমি দেখসি। আর তোর প্রোফাইল-পিকচারে-থাকা ভার্শনটার বিরুদ্ধে ভুল অনুবাদ হওয়ার অভিযোগও শুনসি। মুক্তমনাগুলা এই উক্তিটারে খুব প্রোমোট করে দেখে আরও সন্দেহ হইসে যে, কিছু জিনিস ফিশি। মানে something fishy আরকি।"

"অ। তা হলে দেখা অন্য ভার্শনগুলা।"

"নেট অন করা আছে না? ফোনটা দে।"

"ইয়ে মানে, আমি তো ফ্রি ফেসবুক চালা...." সেঁজুতি এতটুকু বলতেই সন্ধানী ফোনটা নিয়ে গিয়ে কিছু সার্চ দিল। পেইজ লোড হতে হতে সেঁজুতির দিকে চেয়ে সন্ধানী বলল, "ডেটা তো

আছে। মিথ্যা বলিস ক্যান?" সেঁজুতি মুখ ব্যাজার করে পাশের টেবিলে রাখা জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে পান করল।

পেইজ লোড হওয়ার পর সন্ধানী দেখাল, "এই নে। এখান থেকে পড়। '...don't go by reports, by legends, by traditions, by scripture, by logical conjecture, by inference, by analogies, by agreement through pondering views, by probability, or by the thought, "This contemplative is our teacher." When you know for yourselves that, "These qualities are skillful; these qualities are blameless; these qualities are praised by the wise; these qualities, when adopted & carried out, lead to welfare & to happiness" — then you should enter & remain in them.' পার্থক্য বুঝতেছিস আগেরটার সাথে?"

"উঁহু!"

"মাইর খাবি। ভালো করে পড়।"

"আরে বাবা, তুই বলে দে না!"

"একটু যদি মাথাটা খাটাতি জীবনে।" বলে সেঁজুতির মাথায় একটা গুঁতো দিল সন্ধানী।

তারপর নিজেই বলতে শুরু করল, "দ্যাখ, এখানে লজিককে আগেই বাদ দিয়ে দিসে। আবার প্রচলিত ভার্শনে পণ্ডিতদের কথা শুনে বিশ্বাস করে ফেলতে না করেছে। কিন্তু এখানে জ্ঞানীরা যেটার প্রশংসা করে, সেটাকে গ্রহণ করতে বলা হইছে।"

"হুম।"

"তবে উক্তিটার কোনো ভার্শনের সাথেই যে আমি পুরাপুরি একমত, তাও না।" বলে চলল সন্ধানী, "নিজের লজিক, নিজের যুক্তিকে যদি সত্যতার আল্টিমেট মানদণ্ড ধরেই নেই, তাইলে বিষয়টা একটু ঘাউরামি হয়ে গেল না? বিশেষ করে ধর্মগ্রন্থকে যদি বাদ দিয়ে চিন্তা করি। দ্যাখ, স্ক্রিপচার সাধারণত আসে গডের পক্ষ থেকে, বা গডের পক্ষ থেকে ইন্সপায়ারড কারও থেকে। আর লজিক বা রিজন একান্তই আমার। তাই এই স্ট্যান্ডার্ডটা কীভাবে ঠিক করা হইলো যে, স্ক্রিপচারের মতো ধ্রুব জিনিসকে সব সময়েই লজিকের মতো চলক দিয়ে বিচার করতে হবে?"

"ডেটা কানেকশনটা কি একটু অফ করা যায় এইবার? টাকা কাটতেছে।" সেঁজুতি নিচু গলায় বলল।

"তুই কি এতক্ষণ শুনছিস আমি কী বলসি?" সন্ধানী রাগত স্বরে বলল।

"শুনসি তো। কিন্তু কনক্লুশন কী?" আরেকবার পানি পান করতে করতে বলল সেঁজুতি।

"এই পর্যন্ত কনক্লুশন হচ্ছে ঈশ্বর তাঁর বিধানগুলা মানুষকে জানাতে সামহাউ ইন্টারফেয়ার করবেন। আমাদেরকে নিজেদের লজিকের উপর পুরোপুরি ছেড়ে দিবেন না। লজিক দিয়ে কিছু বেসিক বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। যেমন : ঈশ্বর একের কম বা বেশি হলে সৃষ্টিজগৎ বিশৃঙ্খল হয়ে যেত। কিন্তু জীবনের সব ক্ষেত্রে dos and don'ts-এর লিস্ট বানানোর ট্রাই কর। এইখানে কিছু বেসিক রুল সরাসরি ডিভাইন গাইডেন্সের মাধ্যমে তৈরি করতে হবে। এরপর

সেটাকে ভিত্তি ধরে মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির বিল্ডিং বানায়া ফেল, সমস্যা নাই। কিন্তু পুরাটা কাজই শুধু লজিক দিয়ে করা অসম্ভব। তখন একটা পর্যায়ে গিয়ে আর কোনো কূলকিনারা পাওয়া যাবে না। Deism তাই পূর্ণাঙ্গ সমাধান না।” একটানে বলল সন্ধানী।

“রাইট!” সেঁজুতি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, “এজন্যই ঈশ্বর মানুষের রূপ ধরে অবতার হয়ে মর্ত্যে আসেন, তাই না?”

“আচ্ছা, ‘রূপ-ধরা’টা আসলে কী? আকার-আকৃতির স্রষ্টা যিনি, তাঁকে কি ‘রূপ ধরা’, ‘আকার ধারণ করার মতো কোনো কনসেপ্টে আটকানো সম্ভব? মানুষের রূপ-ধরে-থাকা-অবস্থায় গডকে গুলি করলে কি গড মারা যাবে?”

আমতা আমতা করে সেঁজুতি বলল, “...ক্রিশ্চিয়ানরা তো মনে হয় এরকমই কিছু বিশ্বাস করে। গড নিজেই গডের ছেলে, উনি ক্রুশে ঝুলে....”

“বাদ! বাদ!” বাধা দিল সন্ধানী।

“অ্যাঁ?”

“অবতার হাইপোথিসিস বাদ। যেই গড মারা যায়, আমি সেই গডের উপাসক না।”

সেঁজুতির হাসি মিলিয়ে গিয়ে হতাশ দেখাল, “ধুর! আমি তো ভাবতাম তুইই বুঝি মানুষের রূপ-ধরে-আসা কোনো গডেস। আমাকে মোক্ষলাভের পথ দেখাতে আসছিস। যা, যা! তোকে আর পেন্নাম করব না।” বলে আবার পানি পান করল সে।

“বুঝতে পারার জন্য থ্যাংকস।”

“আচ্ছা, একটু নাস্তা দেয়া যাবে? গলায় পানি আটকে গেসে। নামানোর জন্য নাস্তা দরকার।”

“চল কিচেনে।” বলল সন্ধানী, “তুই চা বানা। আমি ডিম-পাউরুটি ভাজি।”

“ইয়েসসসস!”

সন্ধানীর মাসির বাড়ি থেকে কল্যাণী দেবীকে নিয়ে ফেরত এলেন। পূজার মণ্ডপ প্রস্তুতিতে মহা উৎসাহে বোনকে সাহায্য করেন কল্যাণী। বাসায় ফিরে সেঁজুতিকে দেখেই প্রায় ঘণ্টাখানেক যাবৎ আলাপ জুড়ে দিলেন। বহু কষ্টে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে দুই প্রতিবেশী-বান্ধবী চলে গেল সেঁজুতিদের বাসার ছাদে।

“তো... গড তা হলে কীভাবে ইন্টারফেয়ার করেন?” সেঁজুতির জিজ্ঞাসা।

“...বলে আমি মনে করি?” সন্ধানী বলল।

“আরে বাবা, হ্যাঁ ওটাই। গড কীভাবে ইন্টারফেয়ার করেন বলে তুই মনে করিস। আঁতেলদের সাথে কথা বলাটাই একটা জ্বালাতন।” গজগজ করল সেঁজুতি।

“Chosen people এর মাধ্যমে।”

“জোস! মুভিতে যেমন দেখেছি, ওইরকম। দ্য চোজেন ওয়ান!” সেঁজুতির আচরণে উত্তেজনা। কিন্তু একটু পরই অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল, “কিন্তু গড কাকে চোজ করসে, এটা চিনব কীভাবে?”

দিগন্তের-দিকে-তাকিয়ে-থাকা সন্ধানী মুখ ঘুরিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সেঁজুতির দিকে তাকাল, “অ্যাটেস্টেড সিল আর সিগনেচার দেখে।”

“কীহ!”

“হুম।”

“ব্যাখ্যা কর।”

“তুই আমাকে অ্যাটেস্ট করার-সিল নিয়ে জালিয়াতি করতে বলসিলি। তার কিছুক্ষণ পর ফোনে ডেটা নাই বলে মিথ্যা বলতে চাইসিলি। তুই যদি এখন দাবি করিস তুই গডের chosen person, আর তোর কাছে ঈশ্বরের বাণী আসে, তো আমি কখনোই বিশ্বাস করব না।”

“ওকে...”

“ধর একটা মানুষ অ্যাডাল্ট হওয়ার আরও পর আরও ২০-২৫ বছর একটাও মিথ্যা কথা বলে নাই। কোনো খারাপ কাজও করে নাই। ইভেন অন্যকেও খারাপ কিছু করতে বলে নাই। এমন একজন মানুষ সাডেনলি যদি নিজেকে chosen person দাবি করে... may be... just may be, I'll give a thought.”

সেঁজুতি কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, “ওই লোক যদি তোর অপরিচিত হয়? তার ২০-২৫ বছরের লাইফ যদি তুই না দেইখা থাকিস? কেমনে জানবি সে যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির?”

“তাকে যারা ২০-২৫ ধরে দেখসে, তাদের জিজ্ঞেস করব। ইভেন তারা যদি ওই মানুষটার দাবি বিশ্বাস না-ও করে, তার অতীত জীবনের সত্যবাদিতাকে তো অস্বীকার করতে পারবে না।” সন্ধানীর জবাব।

সেঁজুতি আরও কিছুক্ষণ অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। মাথা নেড়ে বলল, “নাহ! মন মানল না। একটু হতাশও হইলাম। লজিক-রিজন-যুক্তি-প্রমাণ সবকিছুকে বাতিল কইরা দিয়া তুই এখন বলতেছিস সত্যবাদিতা টেস্ট করবি, মানুষের মুখের কথার উপর ডিপেন্ড করবি... এইটা কেমন কথা?”

“কারণ, দুনিয়া এভাবেই চলে। আমরা সত্যায়নের উপর, অ্যাটেস্টেশনের উপর, সার্টিফিকেটের উপর ডিপেন্ড করেই জীবনে চলি। লাইফে আমাকে অনেকবার অ্যাটেস্ট করানোর জন্য এই স্যার, ওই ম্যাডাম, সেই ফার্স্ট ক্লাস গ্যাজেটেড অফিসারের পেছনে দৌঁড়ানো লাগসে। এই যে প্রোভোস্ট ম্যাম আমার ছবিতে সাইন দিবেন, এইটাকে সত্যায়ন করবেন, এক্সাম কন্ট্রোলার অফিসের লোকদের সে সাইনে বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। ভার্সিটি যে আমাকে

সার্টিফিকেট দিবে, চাকরিদাতারা সেটার উপর ডিপেন্ড না কইরা পারে না। তারা টাইম মেশিনে করে আমার অতীত দেখে আসতে পারবে না।”

সেঁজুতি কপাল কুঁচকে এখনও অন্য দিকে চেয়ে আছে। সন্ধানী বলল, “দ্যাখ, সেঁজুতি। ইভেন সায়েন্টিফিক দাবিগুলাও আমরা অন্যের কথার উপর ডিপেন্ড করে রিসিভ করি। Peer অর্থ কী? একই রকমের যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য ব্যক্তি। যেমন আমার ক্লাসমেটরা আমার পিয়ার গ্রুপ। আমার পরীক্ষার খাতা আমার ক্লাসমেটরা দেখলে সেটা হবে পিয়ার অ্যাসেসমেন্ট। নতুন সায়েন্টিফিক ক্লেইমগুলোও অন্য সায়েন্টিস্টরা দেখে রিভিউ করে দেয়। পিয়ার রিভিউ। কোনো একটা গবেষণা পাবলিশ করা হবে কি না, এটা এই পিয়ার রিভিউয়ের মাধ্যমেই অনেক সময় নির্ধারণ করা হয়। আমরা যারা সায়েন্স বুঝি না, বা সায়েন্সে পড়লেও সায়েন্টিস্ট না, তাদের কাছে এই পিয়ার রিভিউতে বিশ্বাস রাখা ছাড়া উপায় নাই। সায়েন্সের এই বিষয়গুলা একসময় আমি জানতাম না। প্রথম জানার পর ফিজিক্সের এক ফ্রেন্ডের সাথে প্রচুর রাগারাগি করসি।”

অনেকক্ষণ নীরবতার পর সেঁজুতি বলল, “কিন্তু চোজেন পিপল এখন আর আসে না কেন? আমাকেই কেন হাজার হাজার বছর আগেকার কথাগুলো বিশ্বাস করতে হবে? ঈশ্বর আমাদের যুগে নতুন কোনো চোজেন পার্সন পাঠালেই পারে।”

“আচ্ছা, আজকে থেকে এক হাজার বছর পরে কেউ মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করলেই কি মুক্তিযুদ্ধ মিথ্যা হয়ে যাবে? যুদ্ধের ৫০টা বছর যাইতে পারে নাই। অলরেডি কয়েক ভার্শনের ইতিহাস আছে। আমাদের পরের জেনারেশনটা এসে কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে জীবিত পাবে না, এইটা নিয়ে প্রায়ই উনারা আফসোস করেন। ভাষা-আন্দোলন বা মুক্তিযুদ্ধের সিনেমাগুলা দ্যাখ, পুরানা হয়ে অনেক দৃশ্য অস্পষ্ট হয়ে গেসে। লিখিত দলিল, মুভি, ডকুমেন্ট্রি—সবকিছু নষ্ট হয়, বিকৃত হয়। সত্যবাদিতার চেইনটা বিকৃত হয় না। শুনতে যতই দুর্বল লাগুক, এইটাই আসলে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম সত্যকে জানার।”

সেঁজুতি খানিক নীরবতার পর বলল, “ওয়ার্ডের মাঝখানে 'কৃ' থাকলে আগে তুই উচ্চারণ করতে পারতি না। প্রক্কিতি, বিক্কিতি, আক্কিতি এভাবে বলতি।”

সন্ধানীকে মরিয়া দেখাল, “সেঁজুতি, প্লিজ! বি সিরিয়াস!”

সেঁজুতি বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “সন্ধানী, আমার একটু টায়ার্ড লাগতেছে। আমি নিচে যাই, হ্যাঁ? তুইও বাসায় যা। আমি বুঝতে পারতেছি তোর সাপোর্ট দরকার। আমি সেটা দিব অবশ্যই। তোর বিলিফের কারণে সমাজ বা পরিবার থেকে তোর উপর কোনো চাপ আসলে আমি অবশ্যই প্রতিবাদ করব। কিন্তু আমি নিজে একজন যেমন আছি, ভালো আছি। ধর্মকর্ম নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা করে মাথা নষ্ট করতে চাইতেছি না।”

বাসায় এসে কম্বল-টেনে-দিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমানোর চেষ্টা করল সন্ধানী। প্রচণ্ড হতাশ লাগছে হঠাৎ। সেঁজুতিকে নিজের পাশে আরও একটু বেশি করে আশা করেছিল সে। চারপাশের পৃথিবীটা কেমন ভেঙে আসছে। ঘুম দরকার। ঘুম।

জুটোপিয়া

বড়ো যন্ত্রণায় পড়া গেল। কাঁধের থেকে পার্সটা পড়েছে তো পড়েছেই, একদম বানরের খাঁচার ভেতরে। বিষয় হলো ওটা কীভাবে পুনরুদ্ধার করা যায়, সে চিন্তাই আপাতত সন্ধানীর মাথায় ঘুরছে। এই চিড়িয়াখানায় ঘুরতে আসার আইডিয়াটাই ভুল ছিল।

"মা, অনেক হয়েছে," সাধন বলল, "হাতির ওখানটায় যাই, চলো।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," সুব্রত বললেন, "অনেকক্ষণ তো দাঁড়ালাম।"

এখনও ভক্তিভরে-চেয়ে-থাকা কল্যাণীকে একদম টানতে টানতে নিয়ে গেল বাপ-ছেলে মিলে। সন্ধানী একটু পরে আসার নাম করে দাঁড়িয়ে রইল। এক দল বাঁদর খাঁচার ভেতরে ক্যাঁচকোঁচ করছে। বসে খাঁচার গরাদের ভেতর দিয়ে হাত বাড়ালে পার্সটার নাগাল পাওয়া যায় কি না, দেখা দরকার। যদিও চোখের দেখায় বোঝা যাচ্ছে অনেক দূরে।

সন্ধানী বসে যতদূর পারা যায়, হাত বাড়াল। সম্ভব না হওয়ায় একটু এগিয়ে গিয়ে চেষ্টা করল। বেশ! এবার নাগাল পাওয়া গেছে। পার্সটা ঝেড়েমুছে কাঁধে তুলে পেছন ফিরেই আঁতকে উঠল। সে এখন আর খাঁচার বাইরে না, ভেতরে! চিৎকার করে একবার কেয়ারটেকারকে ডাকল সে।

"কী? কী সমস্যা, বলুন।" ভারি একটা কণ্ঠ পেছন থেকে বলল।

সন্ধানী পেছনে তাকিয়েই আরও জোরে চিৎকার দিয়ে উঠল।

"আরে কী হলো? থামুন। ভয় পাইয়ে দেবেন তো অন্যান্য অধিবাসীদের।" বললেন পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা ভদ্রলোক।

ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠে তোতলাতে তোতলাতে সন্ধানী বলল, "আপনি একটা বা-বা-বা-বা-বানর।"

"জি?" অবাক কণ্ঠে বানরটি বললেন, "ওহ আচ্ছা। নতুন তথ্য জানলাম আপনার কাছে। আগে জানতামই না, আমি যে বানর। তা আপনি যে মানুষ, সেটা জানেন তো?"

"আ-আ-আমি কি আপনাকে এখন প-প্র-প্রণাম করব, হনুমান জি?" এখনও ভয়ে কাঁপছে সন্ধানীর কণ্ঠ।

"আপনার ইচ্ছা। জোর করছে না কেউ। কিন্তু আপনি যে হনুমান জি'র কথা বলছেন, সে আমি নই।"

বন্ধুসুলভ আচরণে হাঁটুতে একটু জোর ফিরে পেল সন্ধানী। বানর বললেন, "আপনার মনে হয় বিশ্রাম দরকার। আসুন, আমার সাথে আসুন।"

বানরটা সন্ধানীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। সামনে এখন আর খাঁচা না, বিস্তীর্ণ মাঠ।

সন্ধানী তাড়াহুড়া করে ব্যাগ থেকে একটা কলা বের করে বলল, "দেখুন, আমি আসলে বেশি কিছু আনিনি। অফারিং হিসেবে এই জিনিসটা দিলে হবে?"

"হবে, ধন্যবাদ।" সন্ধানীর ডান দিক থেকে কী যেন একটা এসে কলাটা নিয়ে গেল। সন্ধানী আবারও চেঁচিয়ে উঠল। দেখতে পেল তার হাত থেকে শুঁড় দিয়ে কলাটা নিয়ে গেছে একটা হাতি।

"এদিকে দিন!" বলে ছোঁ মেরে হাতির শুঁড় থেকে কলাটা নিয়ে নিলেন বানর। "এ অবিচার ঈশ্বর সইবে না।" হাতি বললেন।

একবার বানর, আরেকবার হাতির দিকে কয়েকবার দেখল সন্ধানী। একটু পর বলল, "আপনারা সম্ভবত আমার উপাসনা ডিজার্ভ করেন না। করেন কি?"

"উপাসনা?" কলা খেতে খেতে বললেন বানর, "উমম...." এই বলে খাওয়ার দিকেই মন দিয়ে রাখলেন তিনি।

"উপাসনা না বলে সম্মান বলতে পারেন," হাতির কথায় তার দিকে ফিরল সন্ধানী, "নমস্তে বলার অর্থ তো ঠিক উপাসনা না, সম্মান জানানো।"

"অথবা বলতে পারেন আমাদের মধ্যে পরমেশ্বরের যে এক্সটেনশন বিদ্যমান, সেটাকে উপাসনা করা।" নতুন একটা কণ্ঠ শুনে সামনে তাকাল সন্ধানী, "জীবের প্রতি দয়াও হলো, পরমেশ্বরের আরাধনাও।"

নতুন কণ্ঠটা একটি দাঁতাল শূকরের। কখন এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন, টের পায়নি সন্ধানী। বলল, "প্রথমে শ্রী হনুমান, তারপর শ্রী গণেশ। আপনি কীসের সিম্বল? বিষ্ণুদেবের বরাহ অবতার নিশ্চয়?"

"মতান্তরে ব্রহ্মার।" এই বলে সন্ধানীদের সাথে হাঁটতে শুরু করলেন শূকর।

বানরের ততক্ষণে কলা খাওয়া শেষ। খোসাটা ফেলে দিয়ে বললেন, "সেটাই। ফিলোসফিটা কিন্তু এমনিতে সুন্দর। সকল জীব এক পরমেশ্বরের সৃষ্টি। এদের সম্মান করার অর্থ ঈশ্বরকে সম্মান করা।"

"কিন্তু বিষয়টা তো জাস্ট সম্মানে সীমাবদ্ধ থাকছে না, তাই না? মানুষ তো আপনাদের উপাসনা করা শুরু করে। আমাদের ধারণাপ্রসূত আকারের ঊর্ধ্বে যে স্রষ্টা, তাঁকে সরাসরি এক্সপেরিয়েন্স করার পথে আপনারা বাধা হয়ে দাঁড়ান। দিনশেষে দেখা গেল হাতি-ঘোড়া সবাই ঈশ্বর, মানুষই কেবল দাস। কিন্তু সূত্রমতে তো আমরা নিজেরাও ঈশ্বরের এক্সটেনশন হওয়ার কথা না?" সন্ধানী প্রশ্ন করল।

"হুম। জর্জ অরওয়েল বলেছিলেন," শূকর বললেন, "সব পশু সমান। কিছু পশু অন্যদের চেয়ে একটু বেশি সমান।"

"সঠিক অবস্থান আসলে হওয়ার কথা ছিল দয়া করা, সম্মান না।" একটা নারী কণ্ঠ বলল। এবারে একজন গাভী।

"গো-মাতা?" সন্ধানীর আবারও বিস্মিত হওয়ার পালা।

"ঈশ্বরের দেওয়া বুদ্ধিবলে মানুষ আমাদের কাছ থেকে দুধ-মাখন-ঘি নেবে।" বললেন গাভী, "না হয় মাংসও নিল। বিনিময়ে তারা আমাদের দয়া করবে। সম্মান-ভয়-আশা-প্রার্থনা-উপাসনা-আরাধনা... এগুলো ঈশ্বরকেই দেবে। আমাদের না।"

"ইকোসিস্টেমে," সন্ধানীর পায়ের কাছে হিসহিস করে উঠল নাগের কণ্ঠ, "সবারই কিছু-না-কিছু অবদান আছে। কিন্তু কাউকে অতিরিক্ত ভক্তি দেখাতে গেলে কী বিপদ হয়, তা তো গো-মাতার দেশে দেখাই যাচ্ছে। হিসসস।"

গোখরা সাপটার কাছ থেকে পা সরিয়ে নিতে গিয়ে থেমে গেল সন্ধানী। এখানে কাউকেই আর ক্ষতিকর মনে হচ্ছে না। মানুষ-বানর-হাতি-শূকর-গরু আর সাপের অদ্ভুত দলটা নিজেদের মাঝে কথা বলতে বলতে সামনে হেঁটে চলেছে।

"স্বীকার করছি ব্যাপারটা একটু বিব্রতকর।" শূকর বললেন, "কার্যসমাধা করার জন্য ঈশ্বর নিজেকে আকার-আকৃতিতে সীমাবদ্ধ করাটা। আফটার অল, ভূদেবীকে দানবের হাত থেকে বাঁচিয়ে পানির নিচ থেকে তুলে আনার জন্য বরাহের আকৃতি ধারণ করারই-বা দরকারটা কী?"

"প্রশ্নটা দরকার-বেদরকারের না," মুখ খুললেন হাতি, "সিম্বলিজমের। এই যে শ্রী গণেশের বড়ো মাথা, জ্ঞানের সিম্বল। বড়ো বড়ো কান, মানে সচেতনতা।"

"কিন্তু সবকিছু যদি কেবলই একটা series of symbols হয়," সন্ধানী অধৈর্য হয়ে বলল, "তা হলে তো সবই দিনশেষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। মানুষ যে যার ইচ্ছেমতো অর্থ বের করে নিতে পারে.... এই যে আপনি! বরাহ সাহেব।"

"শুনছি।" শূকর জবাব দিলেন।

"কদিন আগে আমার অধার্মিক বন্ধুদের সাথে একটা বিতর্কে গো-হারা হেরেছি।" একটু থেমে গো-মাতার দিকে তাকিয়ে সন্ধানী বলল, "নো অফেন্স।"

"সমস্যা নেই।" গরু জবাব দিলেন।

"আমার কথা ছিল সমকামিতা এবং পুরো এই LGBTQ++ এর ধারণাগুলো দূষিত, কলুষিত।" সন্ধানী বলল, "কিন্তু ওই বিষ্ণুদেবই তো আমার আর্গুমেন্ট টিকতে দিলেন না। সমুদ্রমন্থনের ঘটনায় তিনি মোহিনী অবতার হয়ে এসেছিলেন অসুরদের ধোঁকা দিতে। এটার রেফারেন্স টেনে নাবিলা বলল আমাদের ধর্মে তো তা হলে ক্রসড্রেসিং বা ট্রান্সজেন্ডারিজম খারাপ কিছু না। কী জবাব দিব বলেন?"

"কী আর করবেন? মেনে নিবেন!" বানর বললেন, "পরাজিত মানসিকতা বরণ করবেন। আজকাল যেমন বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে অনেকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ খুঁজে পায়, সেরকম মডার্ন ব্যাখ্যা দেবেন। আচ্ছা উভচর কচ্ছপের চেয়ে জলচর মৎস্য নীচ, বুঝলাম। স্থলচর বরাহের চেয়ে উভচর কচ্ছপ নীচ, তাও বুঝলাম। কিন্তু শ্রী রাম কী করে বিবর্তনের সিরিয়ালে শ্রী কৃষ্ণের চেয়ে নীচ প্রাণী হলেন? একইভাবে কৃষ্ণও তো কলকি অবতারের চেয়ে নীচু প্রাণী বলতে হয়।"

"আর এতই যদি পশুপাখিদের সম্মান করতে হয়," নাগরাজ সামনে এসে বললেন, "তাদের আবার বলি দেওয়া হয় কেন? হিসসসস! এতই যখন দিনশেষে উদ্ভিদ আর প্রাণী হত্যা তো করাই লাগছে।"

"ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল ড্যান্সের ভূমি নমস্কারের মতো," বললেন শূকর, "নাচের আগে মাটিকে নমস্কার করে আগেই মাফ চেয়ে নেয়, কারণ নাচার সময় পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে হচ্ছে।"

"যেন হাঁটার সময় আঘাত করছে না।" বললেন হাতি।

সব শুনে সন্ধানী বড়ো করে শ্বাস নিয়ে বলল, "তো সব মিলিয়ে আমি চাচ্ছি আরকি এই পশুপাখির আরাধনার বিষয়টা...."

এমন সময় পার্সের ভেতর থেকে ফোন বেজে উঠল। সন্ধানী বলল, "এতো! বাবার কথা তো মনেই ছিল না। আমাকে না পেয়ে টেনশন করছে মনে হয়।"

কিন্তু ব্যাগের আনাচকানাচ হাতিয়েও ফোন পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধানী বলল, "আপনারা কি কেউ আমার ফোনটা নিয়েছেন? নিয়ে থাকলে... ধ্যাৎ!" থপ করে পার্সটা আবার নিচে পড়ে গেল।

সেই শব্দে ভেঙে গেল সন্ধানীর ঘুম। চারদিকে তাকিয়ে সবকিছু মনে পড়তে সময় লাগল একটা সেকেন্ড। ভার্সিটি থেকে বের হতে-না-হতেই ঢাকার একটি কলেজে ভালো বেতনের চাকরি, সেইসাথে ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে সাধনের অসাধারণ রেজাল্ট। দুটি উপলক্ষ একসাথে সেলিব্রেট করতেই আজ সপরিবারে বের হওয়া। চিড়িয়াখানায় ঘুরেটুরে হোটেল থেকে খাবার কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছে চারজনে। অটোরিকশার দুলুনিতে ঘুম এসে পড়েছিল। ফোনের ভাইব্রেশনের চোটে মেঝেতে পড়ে গেছে পার্স।

মুখোমুখি সামনের সিটে বসা বাবা আর সাধন ধরাধরি করে দ্রুত পার্সটা হাতে তুলে দিল। পাশ থেকে কল্যাণী স্নেহভরে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "খুব টায়ার্ড?"

চোখ-মুখ ঝাড়া দিয়ে ফোনটা কেটে দিল সন্ধানী। টু-থ্রি-ফোর-ফাইভ এমন কোনো একটা নম্বর থেকে আসা ফোন। রিসিভ করলেই বিরক্তিকর সব অফারের ফিরিস্তি দিতে শুরু করবে।

এই রাত

মিষ্টির দাম চুকিয়ে দিয়ে হিমাদ্রি বলল, "মামা, তা হলে বাবা-মা আসলে ওদের হাতে প্যাকেটটা দিয়ে দিয়েন। আর আমার জন্য প্রার্থনা করবেন।"

ক্যাশে বসা লোকটা হিমাদ্রির মাথা ছুঁয়ে বলল, "যাও, মামা। ঈশ্বর সহায়।"

দোকানের বাইরেই দাঁড়িয়ে-থাকা স্কুটারে উঠে স্টার্ট দিল হিমাদ্রি। ভাবল, একটা গাড়ি এবার কিনতেই হবে। বাবা-মা'কে রিকশায় তুলে দিয়ে সে রওনা হয়েছে এই ভটভটিতে করে। একটু পরপর থেমে গিয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, যাতে রিকশা খুব বেশি পেছনে পড়ে না যায়।

ভবিষ্যতে যদি পরিবারসহ কোথাও যায়, তা হলে স্ত্রীকে পেছনে বসিয়ে বাবা-মা'কে তুলে দিতে হবে রিকশায়। মা তখন কী অভিশাপই-না দেবেন!

ভাবতে ভাবতে এখানেই তেষ্টা পেয়ে গেছে। পাত্রীর বাড়িতে ঢুকেই যদি এক গ্লাস পানি চায়, তা হলে কি খুব বেশি খারাপ দেখাবে? এমন সময় ফোন বেজে ওঠায় সেটা বের করে কানের কাছে আটকে দিল হেলমেটের মাধ্যমে। "হ্যাঁ, সেঁজুতি। বল। আমরা রওনা দিয়ে দিসি।"

মাসতুতো বোনটা ওপাশ থেকে বলল, "আচ্ছা। ওর ছোটো ভাইটা বাসা থেকে একটু এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। 'সাধন' নাম।"

"আচ্ছা, ঠিকাসে। তুই টেনশন নিস না।"

গন্তব্যের কাছাকাছি এসে পড়ার পর স্কুটারের গতি প্রায় শূন্য করে দিল হিমাদ্রি। বাবা-মা'র রিকশাটা কাছে এসে পড়েছে। রিকশার সমান তালে স্কুটার চালাতে লাগল ও।

মিষ্টির প্যাকেটটা বাবার হাতে। শিলা বললেন, "অ্যাই, মিষ্টিটা বুঝি তুই কিনে আনতে পারলি না? গিফটের নাম করে তোর ঘোষ মামার ব্যবসায় লস করালি? আমাদের থেকেও তো টাকা রাখল না।"

কীঈঈঈঈ! হিমাদ্রি যে টাকা দিয়েছে, এটা ঘোষ মামা বলেনি? আচ্ছা ধুরন্ধর তো! এ যে রীতিমতো কংস মামা!

"আহ! ভাগ্নে যাচ্ছে মেয়ে দেখতে। আজ না হোক কাল একটা নতুন জীবন শুরু হবে। এ উপলক্ষ্যে কি মামা কিছু দিতে পারে না?" শংকর বাবু বললেন, "হিমু! চল তো বাবা। এ নিয়ে তুই আর মাথা ঘামাস নে।"

দিনের শুরুতেই এভাবে মেজাজটা খিঁচড়ে দিলে! আজ যে কপালে কী আছে, কে জানে। এসব চিন্তা করতে করতেই সামনে এক তরুণকে দেখতে পেল হিমাদ্রি। স্কুটার থামিয়ে দিল তার সামনে।

"নমস্কার, দাদা।" বলল তরুণ, "আমি সাধন। সেঁজুতি দি' বলেছে মনে হয়।"
"হ্যাঁ, হ্যাঁ। নমস্কার।"

হিমাদ্রির বাবা-মা রিকশা থেকে নামার পর তাঁদেরকেও হাসিমুখে নমস্কার জানাল সাধন। দুজনেই জবাব দিলেন ভদ্রোচিত কণ্ঠে। হিমাদ্রি বলল, "কাছেই বাসা?"
"এই আর আধ মিনিট লাগবে।"
"পেছনে বোসো তা হলে।" বলে সাধনকে পেছনে বসিয়ে স্কুটার স্টার্ট দিল হিমাদ্রি। ঠিক আধ মিনিট পরেই একটি দোতলা বাড়ির সামনে স্কুটার থামাল হিমাদ্রি, "ও আচ্ছা। এটা তো সেঁজুতিদের বাসার কাছেই। আর আমাকে এমনভাবে বলল, যেন কত দুর্গম রাস্তা দিয়ে যাওয়া লাগবে।"

সাধন হাসল। স্কুটার লক করে রিকশা ভাড়া চুকিয়ে সাধনের সাথে সাথে হেঁটে চলল ওরা তিন জন। কয়েকটা গাছপালায় ঘেরা একটা উঠান পেরিয়েই বিল্ডিং। বাপ-দাদার ভিটে, বেশ পুরনো

ডিজাইনের বাড়ি। প্লাস্টার উঠে-যাওয়া দেয়ালগুলো জানান দিচ্ছে—বাড়িটা তার যৌবন পেরিয়ে এখন বৃদ্ধকালে এসে দাঁড়িয়েছে। বয়স্ক এক ভদ্রলোক গেট থেকে এগিয়ে এসে সম্ভাষণ জানালেন ওদেরকে। হিমাদ্রি নিচু হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিল।

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। দীর্ঘায়ু হও, বাবা।"
"নমস্কার, সুব্রত বাবু।" হাসিমুখে বললেন শংকর রায়।
"নমস্কার! আসুন, আসুন, দাদা। আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।" মিষ্টির প্যাকেটটা সাধনের হাতে দেওয়া হলো। সে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দরজা খুলে দিল।

"জুতো ভেতরে গিয়ে খুলুন। এখানে না।" দরজার কাছে এসে বললেন সুব্রত।
"ওহ আচ্ছা, আচ্ছা।"

সবার খোলা জুতোগুলো এক এক করে জুতোর কেইসে রেখে দিল সাধন। এর মধ্যেই ভেতরের রুম থেকে কল্যাণী বেরিয়ে এসে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করলেন সবার সাথে।

"বসুন, সবাই। বাবা, বোসো, বোসো।" ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন সুব্রত। ড্রয়িং রুমের সোফায় বসে পড়ল সবাই। সাধন কল্যাণীকে বলল, "আমি বারান্দায় বসি।"
"কেন?"
"দাদার বাইক রাখা আছে উঠোনে। খেয়াল রাখা লাগবে।"
"ও হ্যাঁ, ভালো কথা মনে করেছিস। যা, গিয়ে বসে থাক বারান্দায়।"

হিমাদ্রি বলল, "আহহা। সাধনকে শুধু শুধু কষ্ট দিলাম।"
"আরে না, না!" হাত তুললেন সুব্রত, "আজ অতিথি নারায়ণের একটু সেবা করুক না। ভগবান চাইলে না হয় কদিন পর আত্মীয়ের সেবা করবে।"

কথাবার্তা চলতে চলতেই কল্যাণী মেয়েকে নিয়ে এলেন ভেতর থেকে। সাথে নাস্তার ট্রে। হিমাদ্রি ভাবল, "এই রে! নাটক-সিনেমায় যেমন দেখলাম, বাস্তবে দেখি এইরকমই হয়।"

বাবা-মা তো এদিকে কত কথা বলে ফেলছে। হিমাদ্রি আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে আড়চোখে কয়েকবার তাকাল। মেয়েদের রূপবৈচিত্র্য সে তেমনটা ঠাওর করতে পারে না। সিভির পাসপোর্ট সাইজ ছবিতে নিজেকে যেমন ভ্যাবদার মতো দেখা যায়, আয়নার সামনেও ওই একই হিমাদ্রিকে দেখে সে। অথচ এই মেয়েটা! আগে ছবিতে দেখে মনে হয়েছে সদ্য-বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করা চঞ্চল মেয়ে। এখন মনে হচ্ছে পাক্কা সংসারী শান্ত রমণী।

"ওরা তা হলে পরিচিত হোক, কী বলেন আপনারা?" শিলা বললেন।

হ্যাঁ! আরে কোন ফাঁকে যে দশটা মিনিট চলে গেল! বাবা-মা'র সব কথা বলা, সব জিজ্ঞেস করা শেষ? টেরই তো পেল না হিমাদ্রি। এখন নাকি আবার মেয়েটার সাথে পরিচিত হতে হবে। কেমন জানি একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল হিমাদ্রি।

সুব্রত গিয়ে বারান্দা থেকে সাধনকে ডেকে আনলেন। হিমাদ্রিকে এসে বললেন, "তোমরা ওইখানে গিয়ে বোসো, বাবা। শরীর-জুড়ানো বাতাস। দোলনায় বসে আলাপ করতে মন্দ লাগবে না।"

কী আর করা! নিজের পছন্দে মেয়ে দেখতে আসা। সেঁজুতিকে অনেক ঘুষ দিতে হয়েছে পাত্রীর তথ্য জোগাড় করে দেওয়ার জন্য। এখন তো আর পিছিয়ে আসা যায় না।

দুজনে বারান্দায় আসার পর থাই গ্লাসের দরজাটা কেউ একজন আটকে দিল। হিমাদ্রির অস্বস্তি গেল বেড়ে। যেন তাকে বিপদে ফেলার জন্যই পুরনো বাড়িতে থাই গ্লাসের দরজা লাগানো হয়েছে।

দোলনাটা বেশ প্রশস্ত। তিনজন মানুষ পাশাপাশি বসা যায়। পেছনে হেলান দেওয়ার জায়গা, পাশে হাতল। খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে দুজনে বসল দোলনাটায়। উঠোনে রাখা ভটভটিটা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে হিমাদ্রি।

হালকা গলা খাঁকারি দিয়ে হিমাদ্রি বলল, *“Actually I'm not much of a conversation starter.”*

“Neither am I” হাসি দিয়ে তাকিয়ে মেয়েটা বলল।

ত্বরিত ও আন্তরিক উত্তর পেয়ে হিমাদ্রি যেন একটু সাহস পেল। আবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, “বেশ। ফোনে যদিও অনেক বকবক করেছি আপনার সাথে। তারপরও সামনাসামনি কথা বলা তো অন্য জিনিস। যাকগে! সিভিতে যা লিখেছি, নিজের সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি বলার কিছু নেই। পরিবারের ব্যাপারে তো ফোনেই অনেক কিছু বললাম, জানলাম। সংসার পাতলে মেস ছেড়ে দিয়ে ফ্ল্যাট নেবার সামর্থ্য আছে, জাস্ট এতটুকু যোগ করতে পারি। ফ্ল্যাট নিলে আপনারও কলেজে যাওয়া-আসা সুবিধা হবে।”

“আচ্ছা, আচ্ছা।” বলল সন্ধানী।

“আমার পরিবারে আসলে জাত-পাত-বর্ণ, ওসবের অত বাছবিচার নেই। আর... আর আপনি যদি কখনও নিজের ফেইথ পরিবর্তনও করতে চান, আমার কোনো সমস্যা নেই। পরিবার থেকে কোনো আপত্তি করলে আমিই ওদিকটা দেখব। আ.... আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।”

সন্ধানী শুধু মাথা নাড়ল তার দিকে তাকিয়ে।

“সত্যি বলতে... মানে সেঁজুতির থেকে যতটুকু শুনলাম.... আপনার মতো এরকম মুক্ত মানসিকতা আমার খুবই....” বলতে বলতে সন্ধানীর দিকে ফিরেই থমকে গেল হিমাদ্রি। মেয়েটার চোখ দুটো কেমন ছলছল করছে।

হিমাদ্রির বুকটা হতাশায় হাহাকার করে উঠল। মুখে বলল, “দেখেন, আ... আপনি কোনো প্রেশার নিয়েন না। বিয়েতে আপনার অমত থাকলে আপনি নিশ্চিন্তে আমাকে জানান। বললাম তো, আমি এইসব ব্যাপারে একদমই চাপাচাপি করি না। আপনার পরিবারকে এটা নিয়ে কোনো অপমানও সহ্য করতে হবে না। বিশ্বাস করেন...”

সন্ধানী হাত দিয়ে চোখ মুছে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল। বলল, “ওইটা না। আমি আসলে চশমা ছাড়া বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারি না। চোখ ব্যথা করে।”

হিমাদ্রির দেহে প্রাণ ফিরে এল যেন, “ওহহহহ.... এই... এই কথা? তা হলে চশমা পরেন। খুলে রেখেছেন কেন?”

"মা বলল, আগে বিয়েটা হয়ে যাক, পরে চশমা লাগাস।" সন্ধানী সরলভাবে বলল।

"অ্যাঁ?" এই বলে ঠা ঠা করে হেসে উঠল হিমাদ্রি, "এইটা কোনো কথা হলো? আমি কি চশমা খুলেছি? তা হলে আপনাকে খুলতে হবে কেন? প্লিজ, চশমা নিয়ে আসুন।"

হাতের ভেতর কীভাবে যেন এতক্ষণ লুকিয়ে রাখা চশমাটা বের করে চোখে দিল সন্ধানী। বলল, "আপনাকে তো চশমায় বেশ মানায়। আমারটা একটু *nerd*-এর মতো দেখা যায়।" এই বলে হিমাদ্রির দিকে তাকাল সে।

হিমাদ্রি মনে মনে হেসে উঠল। ইয়া বিশাল ফ্রেমের চশমা। কার্টুনে মৌমাছি বা বোলতার চোখ যে-রকম বড়ো বড়ো দেখায়, সে-রকম লাগছে এখন মেয়েটাকে। এইবার হিমাদ্রি বুঝল কেন ছবির সাথে বাস্তবের চেহারা মিলছিল না এতক্ষণ।

"হ্যাঁ, তো ফেইথ নিয়ে কথা বলছিলেন। হ্যাঁ, আমার তো ভালোই হয় যদি ফ্রেন্ডদের সাথে নেয়া বাসাটা ছেড়ে দিয়ে নিজের সংসারে উঠতে পারি। সাথে মনের কথা খুলে বলার মতো একজন মানুষও পাওয়া যায়।"

হিমাদ্রির বুঝতে কিছুক্ষণ লাগল যে, এতক্ষণ ধরে সে যা বকবক করেছে, সন্ধানী এইমাত্র সবগুলোর উত্তর একসাথে দিল।

এখন হিমাদ্রির একটু রিল্যাক্সড লাগছে। দোলনার পেছন দিকটায় হেলান দিয়ে বসল, "তা হলে... আপাতত আস্তিক?"
"হুম।"
"উমম... একেশ্বরবাদী?"
"কিছুটা সংশয়-সহ।"
"তাই? কেন? সেঁজুতি তো কিছু বলে নাই এটার কথা।"
"সেঁজুতিকে জানাই নাই। ইনফ্যাক্ট এখন পর্যন্ত এটা নিয়ে কারও সাথেই আলাপ হয় নাই।"

হিমাদ্রির উত্তেজনা বোধ হলো। সম্ভাব্য স্ত্রী, এখনই তার সাথে একান্তে কোনো কিছু শেয়ার করছে।

"বিলিফ, রিলিজান, এগুলোর ইতিহাস নিয়ে যারা কাজ করেছে, সবাইই তো এককথাই বলে। বহু-ঈশ্বরবাদ থেকে কালক্রমে একেশ্বরবাদের উদ্ভব। সনাতন ধর্মাবলম্বী পরিবারের মেয়ে। সনাতনই থাকতে চাইছি। কথা হচ্ছে, প্রতিমাবিহীন এক ঈশ্বরের আরাধনাই যদি সনাতন হয়ে থাকে, তা হলে গবেষকরা কেন আগে বহু-ঈশ্বরবাদের প্রমাণ পান? দেবদেবীর প্রাচীন মূর্তি খুঁজে পান, একেশ্বরবাদের কোনো চিহ্ন কেন পান না?"

হিমাদ্রি সাথে সাথে বলল, "এটা তো সহজ। একেশ্বরবাদীরা তো ঈশ্বরের কোনো প্রতিমাই বানায় না। তা হলে প্রমাণ থাকবে কী করে? মূর্তিপূজারিরা মূর্তি বানাত, সেটার চোখে-দেখা প্রমাণ আছে। অদৃশ্য ঈশ্বরের পূজা করলে সেটার প্রমাণ কীভাবে থাকবে?"

সন্ধানী ঝট করে হিমাদ্রির দিকে তাকাল, "আরে তাই তো!"

হিমাদ্রি হেসে বলল, "এতদিন ধরে চিন্তাভাবনা করলেন। এত সহজ বিষয় আপনার মাথায় আসে নাই? এ কেমন বিচার?"

সন্ধানীর চোখে এখন কৌতুক, "আমিও এতদিন এটাই ধারণা করে এসেছি। আপনাকে জাস্ট টেস্ট করলাম।"

ঢোক গিলল হিমাদ্রি। বড়ো বাঁচা বেঁচে গেছে। মিষ্টি কেনার ঘটনা থেকেই আসলে তার মাথায় এই উত্তরটা এসেছে। কোনো প্রমাণ নেই বলে বাবা-মা'কে এখন আর বিশ্বাসই করানো যাবে না যে, সে টাকা খরচ করে ওগুলো কিনেছে।

বেশ কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।

"বিয়ের পর আমাকে ভেসপা চালানো শিখাবেন?" উঠানে দাঁড়ানো স্কুটারের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল সন্ধানী।
"মানে স্কুটার?"
"অ, সরি। স্কুটার।"
"হ্যাঁঅ্যাঁ, শিখাব।"

সন্ধানী আর কিছু বলল না। আকাশে ভরা পূর্ণিমা। হিমাদ্রির এখন জোরে জোরে শিস বাজাতে ইচ্ছে করছে। সম্ভব না। পেছনের রুমেই বয়স্করা আছেন। তারপরও নিচু শব্দে একটা সুরে শিস দিতে লাগল সে, "*এই রাত তোমার আমার...*"

ড্রাইভিং লেসন

গ্রাউন্ড ফ্লোরে কার পার্কিঙের জায়গাটায় অনেকক্ষণ ধরে ব্যস্ত হয়ে পায়চারি করছে সন্ধানী। লিফটের বাটন টিপে দিল। লিফট উপরে উঠতে উঠতেই অধৈর্য ভঙ্গিতে পা ফ্লোরে ঠুকল কয়েকবার। "উফ! বিজ্ঞান এত আগায়ে গেল, এখনও চারতালায় উঠতে পাক্কা চার সেকেন্ড সময় লাগে।" স্বগতোক্তি করল সে।

টুং শব্দ করে দরজা অর্ধেক খুলতেই ওপাশে অপেক্ষারত হিমাদ্রির শার্টের কলার টেনে তাকে লিফটের ভেতরে নিয়ে এল সন্ধানী। কলার ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা করতে করতে হিমাদ্রি বলল, "আবার উপরে আসছ কেন?"

"তোমার দেরি দেখে।"
"দরজাটা লক করতে যত সেকেন্ড লাগে, তত সেকেন্ড দেরি হইছে কেবল।"

আবারও টুং করে দরজা খুলে তাদের দুজনকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামিয়ে দিল। "তো লিফট ওঠানামার আরও চার-পাঁচ সেকেন্ড আছে না?" সন্ধানী বলল।

"এত অধৈর্য হইলে অ্যাক্সিডেন্ট নিশ্চিত।"

হিমাদ্রির আগেই একরকম দৌড়ে গিয়ে স্কুটারে উঠে বসল সন্ধানী।

"হেলমেট! হেলমেট!" দূর থেকে আসতে আসতে হিমাদ্রি মনে করিয়ে দিল।

ঘরঘর শব্দ করে গেট খুলে দিল গার্ড। হিমাদ্রি বসার আগেই সন্ধানী আবার উঠে গেল।
"সমস্যা?"
"এই ঢালটা পার করে দেও।"

হিমাদ্রি ড্রাইভিং সিটে বসল। গেটের সাথে যানবাহন ওঠানামার ঢালু অংশটা দিয়ে নামিয়ে আনল স্কুটার।

সন্ধানী পেছন পেছন দৌড়ে এসে আবার ঠেলাঠেলি শুরু করল, "যাও, যাও। এবার পিছনে বসো।"

একটা হেলমেট সন্ধানীর মাথায় বসিয়ে দিল হিমাদ্রি, "আজকে এই চক্রাকার রাস্তাটা ঘুরবা শুধু। আধা ঘণ্টার বেশি না।"

স্টার্ট দিতে দিতে সন্ধানী বলল, "আজকে তোমার অফিস পর্যন্ত দিয়ে আসি।"
"কী? না, না। এখনই বাসের রাস্তায় উইঠো না। রিকশা-গাড়ির রাস্তায় থাকো।"

স্কুটার চলতে শুরু করল, "ওইটা তো গত এক সপ্তাহ ধরে চলতেসি।"
"যেইটাই হোক। আমার অফিস পর্যন্ত গেলে তুমি আবার ব্যাক করবা কীসে?"
"এইটা আমাকে দিয়ে দেও। তুমি আরেকটা ভটভটি কিনো।"
"হেঁহ! শ্বশুরবাড়ির আবদার আরকি।"

কর্মসূত্রে দুজনই ঢাকায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সংসার একটু গুছিয়ে এনেছে। সন্ধানীদের কলেজে রমজানের বন্ধ দিয়ে দিলেও হিমাদ্রির আরও বেশ কদিন অফিস আছে।

"কন্ট্রোল আগের চেয়ে ভালো না এখন, হিমু?" বেশ কয়েক মিনিট রাস্তায় আস্তে আস্তে চালানোর পর বলল সন্ধানী।

হিমাদ্রি এর আগে টেনশনে শক্ত হয়ে পেছনে বসে থাকত। এখন বেশ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ-খেয়াল-করার-ভঙ্গিতে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভালোই। সামনের লুকিং গ্লাসের দিকে খেয়াল রাখবা—পিছনে গাড়ি-টাড়ি আসতেছে কি না।"

"তুমি বলে দিয়ো, ওস্তাদ! বাঁয়ে প্লাস্টিক।"

"ওইটা তো এখন বলতে পারতেছি। যখন একা একা চালাবা, তখন কে বলবে কোনদিকে প্লাস্টিক?"

সন্ধানী চুপ হয়ে গেল। বেশ অনেকক্ষণ পর বলল, "অ্যাই হিমু! স্কুটার আর ভেসপার মধ্যে পার্থক্য কী?"

খানিক হেসে হিমাদ্রি বলল, "একটা এক ধরনের যানবাহন, আরেকটা বোলতা।"
"অ্যাঁ?"

হিমাদ্রি হা হা করে হেসেই চলেছে। সন্ধানী কিছু বুঝতে পারছে না। হাসি থামিয়ে হিমাদ্রি বলল, "এই যে সামনে পা রাখার জায়গা আছে, এই ধরনের মোটরসাইকেলের নাম স্কুটার। আর ভেসপা হইল একটা ইটালিয়ান স্কুটার কোম্পানি। ভেসপা শব্দটার অর্থ বোলতা।"

"অ।" বিব্রত ভঙ্গিতে বলল সন্ধানী, "তো এত হাসার কী হইল? না জানতেই পারি।"

"হা হা। না, ঠিকাছে। সমস্যা নাই। আমাদের দেশে দুইটাকে এক করে ফেলসে তো। না জানাই স্বাভাবিক। যেমন হোন্ডা আর মোটরসাইকেলের মতো।"

"এই দুইটাও কি আলাদা?"

আরেক চোট হাসল হিমাদ্রি। "হ্যাঁ। হোন্ডা একটা জাপানিজ মোটর কোম্পানি।"
"ওইটা তো হোন্ডা। আর এইটা হুন্ডা।"
"আরে ওই হোন্ডাকেই বাঙালিরা হুন্ডা বানায়ে ফেলসে। হোন্ডা কোম্পানি থেকে শুধু মোটরসাইকেল না, গাড়িও তৈরি হয়। এখন আবার জিজ্ঞেস কইরো না সেলাই মেশিন আর সিঙ্গার আলাদা জিনিস কি না।"
"না, ওইগুলা আলাদা। জানি।"

এই বলতে বলতেই বাসার সামনে দিয়ে পার হলো দুজনে। না থামিয়েই আরেক রাউন্ড দেওয়ার জন্য চালিয়ে গেল সন্ধানী। জিজ্ঞেস করল, "তোমার টাইম আছে? দেরি হয়ে যাবে না তো?"

"আছে, সমস্যা নাই। চালাও তুমি।"

"ওকে।" একটু পর বলল, "অ। এই তা হলে ব্যাপার? একটা কোম্পানির নাম দিয়া আমি এতদিন প্রোডাক্ট চিনতাম?"
"জি।"
"অসাম!"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর সন্ধানী বলল, "একটা বিষয় মাথায় ঘুরতেসে।"
"কী?"
"বেশিরভাগ ধর্মের নামের একটা ব্যাপার। এইদিকে বেদে তো আসলে নির্দিষ্ট করে ওই অর্থে রিলিজানের কথা নাই।"
"হুম। সংস্কৃত 'ধার্মা' কথাটা *organized religion* অর্থে ইউজ হয় না।"
"না। কিন্তু এই বিলিফ সিস্টেমের অনুসারীদের নামটা কোনো আদর্শিক নাম না, ভৌগোলিক নাম।"

"ওইটা তো জানা কথা। সিন্ধু নদীর পাড়ে যারা থাকে, বিদেশিরা এসে তাদেরকে বলসে হিন্দু। এরপর তাদের বিলিফ সিস্টেমের নামও হয়ে গেছে হিন্দুত্ববাদ, হিন্দুইজম।"

"শুধু এইটাই না। ইহুদি ধর্মও একটা এথনিক ধর্ম, যতটুকু জানলাম। ইজরায়েল আর জুডাহ'র বংশধরদের কালচার, জাতীয়তা, এথনিসিটি এইগুলো মিলায়ে একটা ধর্ম। এইখানেও তো আদর্শের চেয়ে ভূগোলটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে গেল না?"

"হয়েছেই তো। হিন্দু আর ইহুদিদের মধ্যে খুব একটা মিশনারি অ্যাক্টিভিটি নাই, দেখো না? কেউ কখনও ধর্মান্তরিত হয়ে হিন্দু বা ইহুদি হতে পারবে না। যে একবার এইসব পরিবারে জন্মেছে, সে চিরকাল হিন্দু। নয়তো চিরকাল ইহুদি। 'বাপ-দাদার ধর্ম' কথাটা এ কারণে ভারত উপমহাদেশে খুব চলে।"

"মানে বাপে যেই ধর্মে ছিল, ওইটা চেইঞ্জ করাটাই একটা পাপ।"

"হুম, যেমন এশিয়ায় জন্মানোর পর ইউরোপিয়ান হওয়ার ট্রাই করা। ক্রিশ্চিয়ান আর মুসলমানরা আবার সেই লেভেলের মিশনারি। দেশ-বিদেশে ঘুরেফিরে ধর্ম প্রচার করে আর অন্যদের কনভার্ট করে।" বলতে বলতে সামনে একটু এগিয়ে এসে বাইকের কন্ট্রোল ঠিক করে দিল। সন্ধানী দুই লেনের প্রায় মাঝামাঝি চলে যাওয়ায় পেছন থেকে হর্ন দিতে শুরু করেছিল একটা গাড়ি।

"আবার..." কথা থামিয়ে আরেকটা গাড়িকে সাইড দিল সন্ধানী। তারপর বলল, "আবার ক্রিশ্চিয়ানিটি নামটাও তো একজন ব্যক্তির সাথে রিলেটেড। ক্রাইস্ট। যদিও ক্রাইস্ট উনার ধর্মে ঈশ্বরের অবতারের মতো অনেকটা। তারপরও কোনো আদর্শের নাম ব্যক্তি বা স্থানের নামে না হয়ে বিমূর্ত একটা নাম হওয়া উচিত আমার মতে। তা হলে একটা সর্বজনীন ভাব আসে। এই বিষয়টা বেশিরভাগ ধর্মেই দেখি না।"

"বিমূর্ত বলতে?"
"মানে একটা আইডিয়া। ধরো, নিজেকে সমর্পণ করা। গডের কাছে বা স্রষ্টার কাছে সাবমিট করা নিজেকে। শব্দের শেষে কোনো ইজম-টিজম থাকবে না এই Hinduism, Judaism, Sikhism, Baha'ism এগুলার মতো।"
"অ।"

"আবার আমি যতটুক জানলাম, প্রায় সব রিলিজানের নামই ওই ধর্মের মেইন ফিগার মারা যাওয়ার পর তৈরি হওয়া। মানে বুঝসো? মেইন ধর্মগ্রন্থগুলোতে ওই আদর্শটার নাম নাই। বেদের কথা তো আলাদা, এখানে 'ধার্মা'র কনসেপ্ট ভিন্ন জিনিস। কিন্তু তবু। বেদ, বাইবেল, তোরাহ কোনো কিছুতে নাকি এই বেদান্তবাদ, ক্রিশ্চিয়ানিটি, জুডাইজম শব্দগুলা নাই। একটা খালি ব্যতিক্রম..."

"অ্যাই কী করো? কী করো? মেইন রোডে উঠতেসো কেন?" জোরে চেঁচিয়ে উঠল হিমাদ্রি।

"একটু যাই? পাঁচ মিনিট?" সন্ধানী অনুরোধের স্বরে বলল।
"বাসের চাপা খাইয়া মরবা। ব্যাক করো। ব্যাক করো বলতেসি।"
"আচ্ছা দুই মিনিট চালাই। একদম স্লো করে। এরপর তুমি ড্রাইভ করে আমাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে আইসো।"

এখনও অফিসযাত্রীরা বের না হওয়ায় রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা। আগ-পিছ ভেবে হিমাদ্রি বলল, "আচ্ছা, ঘড়ি ধরে দুই মিনিট। মনে থাকে যেন। একদম সাইড ঘেঁষে চালাবা। আর এখন কথা অফ।"

“ইয়েস, স্যার...”

পেছনে একটা আর্তচিৎকার শুনে চমকে উঠল দুজনই। সন্ধানী স্কুটার চালানো অবস্থায় পেছনে তাকানোর সাহস পেল না। হিমাদ্রি বলল, “হায় হায় রে!”
“কী হইছে?”
রিকশায় বসা এক নারী হাউমাউ করে চিৎকার আর কান্নাকাটি করছে, “আমার বেতন-বোনাস সব...”

সন্ধানীদের পেছন থেকে সাঁই সাঁই করে ছুটে আসছে একটা মোটরবাইক। তাতে দুজন আরোহী। ছিনতাইকারী। ঈদে বাড়ি ফেরার মৌসুমের পাকা ব্যবসায়ী।

সন্ধানী কী মনে করে স্কুটারের নাক একপাশে ঘুরিয়ে দিল। হিমাদ্রি ধমকে উঠল, “সোনু, খবরদার! কোনো পাগলামি করবা না, সোনু...”

রাস্তা ব্লক-করে-ফেলা স্কুটারটাকে তীক্ষ্ণভাবে পাশ কাটাতে গিয়ে পিছলে গেল ছিনতাইকারীদের বাইক। বিকট শব্দে রাস্তায় আছড়ে পড়ল দুজনে। মারাত্মকভাবে জখম হওয়া পেছনের জনের হাত থেকে লেডিজ ব্যাগটা পড়ে গেল। চারপাশ থেকে দৌড়ে আসছে বেশ কয়েকজন লোক।

চালকের আসনে থাকা ছিনতাইকারী হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে সঙ্গীকে ফেলেই দৌড়ে পালাতে যাচ্ছিল। সন্ধানীদের পাশ দিয়ে যাবার সময় ডান হাতটা মুষ্টি পাকিয়ে সন্ধানীর মুখ বরাবর সজোরে এগিয়ে আনল। হিমাদ্রির শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। ডান হাত দিয়ে খপ করে ধরে ফেলল সেই দুর্বৃত্তের হাতটা। সন্ধানী চিৎকার দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল।

গণপিটুনির ভয়ে মরিয়া দুর্বৃত্ত লোকটা বাম হাতে থাকা ছুরিটা এলোপাথাড়ি বাতাসে চালাচ্ছে। চা-দোকানদার আর রিকশাওয়ালার মতো দেখতে দুজন সাহসী লোক তাকে দুদিক থেকে জাপটে ধরল। হাত মোচড় দিয়ে ছুরি ফেলে দিল। সন্ধানী মুখের উপর থেকে আস্তে আস্তে হাত সরিয়ে চারদিকে দেখল। শরীরটা ঠাণ্ডা লাগছে কেমন যেন।

“হিমু,” দুর্বল কণ্ঠে বলল, “তোমার হাতে রক্ত কেন?” বলতে বলতে স্কুটার থেকে একদিকে হেলে পড়ে যেতে নিল সে।

চারদিকে প্রচুর লোকজন জড়ো হয়ে তখন দুর্বৃত্ত দুজনকে আটকে ফেলেছে। পুলিশের গাড়ির সাইরেন এগিয়ে আসছে কোথা থেকে যেন।

ওদিকে পাগলের মতো কাঁদতে শুরু করেছে হিমাদ্রি। “সোনু! এইটা কী করলা? কেন করলা?”

“অফিসার! অফিসার সাহেব! আমাদের একটু হাসপাতালে নিয়ে যান।” সন্ধানীকে কোলে তুলে নিয়ে পুলিশের গাড়িটার দিকে দৌড়ে যেতে যেতে হিমাদ্রি বলল। অসম্ভব হালকা লাগছে সন্ধানীর শরীরটা। গত বেশ কয়েকদিন ধরে তাকে সকালে নাস্তা করতে দেখে না হিমাদ্রি।

“ওহ। ওইটা আমার রক্ত?” কথাগুলো বলতে বলতে মুখ জড়িয়ে এল সন্ধানীর। আওয়াজ বেরোলো না ঠিকমতো।

মন্ত্রের সাধন

এই গাছের। একটা লেবু গাছের সামনে দাঁড়িয়ে হিমাদ্রিকে বললেন সুব্রত।

সন্ধানীদের বাড়িতে যতবার ভাত খেয়েছে, ততবার সামনে রাখা ছিল ফালি ফালি করে কাটা লেবু। পাগল করা ঘ্রাণ। সন্ধানীর নিজ হাতে লাগানো গাছ।

কতক্ষণ সময় পার হয়েছে, টের পায়নি কেউই। বেশ অনেকক্ষণ ধরে বাড়ির পাশের ছোট্ট উঠানটা হিমাদ্রিকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন সুব্রত সেন। হিমাদ্রি যে আগে দেখেনি, তা না। দেখেছে। একদমই অল্প কয়েকটা গাছ। আনাড়ি হাতের অনিয়মিত যত্নে কোনোটা মরে গেছে, কোনোটা শুকনো, কোনোটা ভাগ্যক্রমে টিকে গেছে। এই লেবু গাছটার মতো।

ঘরের ভেতর থেকে আবার চ্যাঁচামেচির আওয়াজ শোনা গেল। “ওফফ....” নিচের দিকে তাকিয়ে বড়ো করে শ্বাস ছাড়লেন সুব্রত বাবু, “আর ভালো লাগে না।” আস্তে আস্তে মাথা তুলে হিমাদ্রির দিকে চেয়ে বললেন, “কী ঝামেলায় যে আমাদের ফেলে গেছে তোমার স্ত্রী!”

হিমাদ্রি কিছু বলল না।

সুব্রত ঘরের ভেতর চলে গেলেন। হিমাদ্রি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিজেও পেছন পেছন এল।

“দ্যাখ, সুরমা! এখন তোর ওসব চ্যাঁচামেচি আমার মোটেও ভালো লাগছে না।” ঝগড়ার ভঙ্গিতে ছোটো বোনকে বললেন সুব্রত।

“তা আর লাগবে কেন, দাদা?” সুরমা নামের মহিলাটা বললেন, “এতদিন যে পেলেপুষে যবন বড়ো করেছ, তা তো আর আমাদের জানাওনি।”

“একদম চুপ!” সুব্রতর চিৎকারে আশপাশের সব আত্মীয়া থমকে গেলেন। এতক্ষণ সবাইই মাতম করে চলেছিলেন। কেউ সন্ধানীর মৃত্যুর দুঃখে, কেউ আজকের অসনাতন কাণ্ডকারখানা দেখে। কেউ দুটো কারণেই।

হিমাদ্রি এগিয়ে গিয়ে সুব্রতকে ধরল, “বাবা! আপনি উত্তেজিত হবেন না তো। বসেন, বসেন বলছি এখানে।” সুব্রত বাবু আস্তে আস্তে হেঁটে এসে সোফাটায় বসে পড়লেন। তারপর থেমে থেমে বলতে শুরু করলেন, “সন্ধানীর এই ইচ্ছার পেছনে কারণ আছে। শুধু শুধু সে এই অনুরোধ করেনি।”

তার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে সান্ত্বনা-দিতে-থাকা হিমাদ্রি স্মৃতিতে হারিয়ে গেল। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত। সন্ধানীর সাথে তার প্রথম সামনাসামনি কথোপকথনের দিন যেমন ছিল, ঠিক তেমনই। কংক্রিটের রাজধানীতে তো আর মাটির উঠোন পাওয়া সম্ভব নয়। ছাদে তাই লম্বা লম্বা কয়েকটি পাত্রে মাটি ভরে দিয়েছিল হিমাদ্রি। সন্ধানী আর সে মিলে ছোটো ছোটো টমেটো চারা বুনে দিল তাতে।

“এইবার খুশি?” জিজ্ঞেস করল হিমাদ্রি।
“না, খুশি না।” অভিমানী কণ্ঠে বলল সন্ধানী।

"কী বিপদ! আবার কী হইল?"
"যেদিন পুউউরো ছাদ গাছ দিয়ে ঢেকে ফেলতে পারব, ওইদিন খুশি হব।"
"এমন করলে বাড়িওয়ালা বুড়া এসে আগুন জ্বালায়ে দিবে গাছে। এমনিতেই আমাদের যন্ত্রণায় রাতে ছাদ খোলা রাখা লাগতেছে তার।"
"ইশ! বুড়ার নাক কাইটা দিমু না?" হাজার বছর ধরে উপন্যাসের টুনির অনুকরণে সন্ধানী বলল।
"নাক না হয় কাটলা। কিন্তু জীবনে এত জায়গায় যে এত বীজ আর চারা লাগায়ে আসলা, আর খোঁজ-খবর নিসো কোনোটার?"

সন্ধানীর মুখ ব্যাজার হয়ে গেল। বলল, "ক্যাম্পাসেই মনে হয় কয়েক হাজারটা আছে এইরকম।"
"তোমাদের বাসার উঠানের ওইগুলাই তো বেশিরভাগ শামুকে খেয়ে শেষ করল।"

দুজনে হাত ধরে হাঁটতে লাগল ছাদের এদিক-ওদিক। "এতকিছু তো জানি না। শখের বশেই না এসব করি।"
"তো এত বছর ধরে বাগান করতেসো, এগুলা শিখবা না কীভাবে যত্ন নিতে হয়?"
সন্ধানীকে দেখে মনে হলো—পড়া না-পারা ছাত্রীর মতো কোনো রকমে স্যারের সামনে থেকে পালাতে চাইছে। অজুহাত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "কয়েক বছর আগের কথা, বুঝসো? এক ধর্মীয় লিডারকে নিয়ে পড়ার সময় উনার একটা কথা জানসিলাম। কোনো বিলিভার যদি কোনো গাছ লাগায়, সেটা কোনো পশুপাখি খাইয়া ফেললেও পুণ্য হয়। এই যে হলের বারান্দায় লাগানো গাছটা থেকে সবাই খালি মরিচ চুরি করত, অন্তত চোরদের তো কিছু উপকার করতে পারলাম। পারলাম না?"
"পুণ্যের ভারে তো ম্যাডাম তা হলে ভাইঙ্গা পইড়া যাচ্ছেন, নাকি?"

হিমাদ্রির কথায় সন্ধানী ফিক করে হেসে ফেলে পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, "কিন্তু একটা বিষয় খুব খারাপ লাগবে, বুঝলা হিমু?"
কণ্ঠস্বরের এই হঠাৎ পরিবর্তনটা কেমন অশুভ অশুভ লাগল হিমাদ্রির কাছে।
"আমি যত গাছের যত্ন এই জীবনে নিলাম, আমি মরার পর আমার একার কারণেই এর চেয়ে বেশি গাছ নষ্ট হবে। কেমন লাগে না ভাবলে?"

টাইলসে-বাঁধানো একটা বসার জায়গায় সন্ধানীকে নিয়ে বসে পড়ল হিমাদ্রি।
"একটা ডেডবডি পোড়াতে ছয় ঘণ্টা লাগে। কাঠ লাগে পাঁচ-ছয় শ কেজি। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান জানি না। ইন্ডিয়ায় প্রত্যেক বছর পাঁচ-ছয় কোটি গাছ পুইড়া যায় এই লাশ পোড়াতে গিয়াই। আট মিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। পরে ছাইগুলা নিয়ে আবার ফালায়ে দিবে পানিতে। আরও সমস্যা।"

হিমাদ্রি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "হুম, বুঝলাম। কিন্তু কথাগুলা তো তোমার আগের কথার সাথে মিলতেছে না।"
সন্ধানী মাথা তুলে তাকাল। হিমাদ্রি বলে চলেছে, "তুমি না বললা কোনো ধর্মের বিধান নিয়ে প্রশ্ন তুলবা না? শুধু ফিলোসফিক্যাল পার্টটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করবা?"
সন্ধানী এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে বলল, "ফারজানা ম্যামের কথাই ঠিক।"

"কোন ফারজানা ম্যাম?"
"চিনবা না। আমাদের ভার্সিটির। উনি বলসিলেন ধর্মের বিধানগুলো ওই ধর্মের ফিলোসফিরই এক্সপ্রেশন। তাই সব সময় না হলেও মাঝে মাঝে এগুলা নিয়ে চিন্তা করাই যায়। আর... আর.... পুনর্জন্ম একটা চক্র। এইটার কোনো শেষ নাই। মোক্ষলাভের পর আত্মা স্বর্গে যাবে। পুণ্যের ফল ভোগ করে আবার জন্মাবে। আবার চক্র শুরু। এরকম ফিলোসফির তো উচিত ছিল পরিবেশের ব্যাপারে আরও সচেতন হওয়া। আব্রাহামিক ধর্মগুলো বলে পৃথিবী একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ ওই ধর্মগুলোই এভাবে লাশ পুড়িয়ে পরিবেশ দূষণ করে না।"
বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল হিমাদ্রি।

"আর আত্মা সহজে বের হয়ে যাওয়ার জন্য নাকি বাঁশ দিয়ে দূর থেকে খুলি ফাটিয়ে দেয়, ইশশশ!" বলে শিউরে উঠল সন্ধানী।
"হাড্ডি ভাঙার আওয়াজটা কী রকম, জানো?" এই বলে হিমাদ্রি মুখ দিয়ে হাড় ভাঙার শব্দটা নকল করল।
সন্ধানী চমকে উঠে রাগত স্বরে বলল, "*Not funny!*"
"সরি। হা হা হা!"

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর হিমাদ্রি বলল, "তা হলে সিদ্ধান্ত কী? মাটিচাপা দেওয়া বেশি ভালো?"
"হুম। কবরস্থানগুলা দেখতেও তো কী সুন্দর লাগে। পুরাটা জুড়ে শুধু লতা-গুল্ম-গাছ আর পালা।"
"এমনকি তুমি-আমি মরার পর...." সন্ধানীর চেহারার-উপর-চলে-আসা চুলগুলো সরিয়ে হিমাদ্রি বলল, "আমাদের পাশাপাশি দুইটা কবর হতে পারে। মরার পরেও একসাথে মিশে থাকলাম, সতীদাহ ছাড়াই।" বলতে বলতে সন্ধানীর মুখটা নিজের দিকে টেনে আনল হিমাদ্রি।

"স্যার, গেটে তালা মারুম। নিচে যান গিয়া।" কেয়ারটেকারের কণ্ঠ শুনে ঝট করে সরে এল দুজন।
সেই সাথে হিমাদ্রিও ফিরে এল বাস্তবে। অসহ্য বর্তমানে। সন্ধানীর মৃতদেহটা তাদের সেই উঠোনে একটি খাটিয়ায় পড়ে আছে, মাটিচাপা পড়ার অপেক্ষায়। আর এদিকে ঘরের ভেতর আত্মীয়রা চিৎকার করে চলেছে পক্ষে-বিপক্ষে।

"দেখুন, আপনারা চাইলে আমাদের চলে যেতে কোনো আপত্তি নেই।" ফারজানা বললেন।
"না, না, ম্যাডাম!" কান্নার গমক আটকাতে আটকাতে বললেন কল্যাণী।
সেঁজুতি বলল, "আপনাদের কি আমরা কেউ চলে যেতে বলসি? এমন কথা বলতেছেন কেন? থাকেন আপনারা। বসেন।" চোখ দুটো লাল হয়ে আছে তার কান্না করতে।
"এক যবন মরছে, অন্য যবনরা তো দেখতে আসবেই। চইলা যাবার কী আছে?" সন্ধানীর মাসির বিড়বিড়ানিটা স্পষ্ট শুনতে পেল ইলমা। এসব নিচু গলার কথাবার্তা ঠিকঠিক শুনে ফেলার কী যেন এক বিশেষ ক্ষমতা আছে তার, নিজেই অবাক হয়ে যায়। ফারজানা ম্যাডামকে বসিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল সেঁজুতির পাশে। সন্ধানীর মৃত্যুর খবর শুনে দুজনে জার্নি করে এখানে চলে এসেছে। এখন এসব আচরণ অসহ্য লাগছে।

সন্ধানীর আরেক কাকা এগিয়ে এসে সুব্রতকে বললেন, “দেখেন দাদা, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেল। ঠাকুরের যা ইচ্ছা। মেয়ের অন্ত্যেষ্টিটা সনাতন ধর্মাচার মেনেই হোক। জীবদ্দশায় না হয় সনাতন ধর্ম থেকে একটু বখে গেছে, তাতে....”
“আমার মেয়ে আপাদমস্তক সনাতন ধর্মাবলম্বী ছিল। আপনাদের যে-কারোর চেয়ে বেশি।”
উপস্থিত সবাই কণ্ঠটা অনুসরণ করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। কল্যাণী দেবীর মুখ-চোখ কখনও এত কঠিন মনে হয়নি। কখনও তিনি এত দৃপ্ত-দৃঢ় কণ্ঠে কথা বলেননি।

কোদাল রেখে কপালের ঘাম মুছল সাধন। হিমাদ্রিও ক্লান্তিতে বসে পড়ল। এতক্ষণ তাদের মাথার-উপর-ছাতা ধরে রাখা সুব্রত আর শংকর বাবু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন দুজনকে ঘরের ভেতর নিয়ে ফ্যানের নিচে বসাতে। হিমাদ্রি হাতের ইশারায় বোঝালো সমস্যা নেই। কল্যাণী, সেঁজুতি-সহ অনেকে তখনও কবরটার পাশে বসে আছে। কেউ ছুঁয়ে দেখছে।
বড়োরা একটু দূরে গেলে হিমাদ্রি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, “সাধন! তুই কিচ্ছু ভাবিস না। আমি এখন তোদের ফ্যামিলি মেম্বার। তুই মন দিয়ে পড়াশোনা কর। বাবা-মা আর তোর যা খরচপাতি লাগে, আমি দিব।”
সাধনও হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, “জামাইবাবু!”
“হুম? বল।”
“খরচপাতি মেইন কথা না। আপনি দিদির সাথে সময় কাটিয়ে যা যা জানসেন, আমাকে জানায়েন। দিদি যা সন্ধান করে গেছে, আমি তা সাধন করতে চাই।”

হিমাদ্রি কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে থাকার পর বলল, “হুম? হুম। অবশ্যই। অনেক কথাই বলার ছিল। নতুন জীবন শুরুর উত্তেজনায় সব হয়তো জানতে পারি নাই। লাইফ এনজয় করতে করতেই তো এই দেড়টা মাস গেল... তবে তুই চিন্তা করিস না। যা জানতে পারসি, তা-ই তোকে জানাব। অবশ্যই জানাব।”

“হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, সেটা মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পুজো করো, তারা কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না; যদিও তারা সকলে একত্র হয়। আর মাছি যদি তাদের নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবে তারা তার (মাছির) কাছ থেকে তা উদ্ধারও করতে পারবে না। পূজারি ও পূজিত কতই-না দুর্বল!”

— [সূরা আল-হাজ্জ, (২২) : আয়ে□ ৭৩]